দ্বীনী শিক্ষার নৈতিকতা

সূচীপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

:

বাহ্যতঃ দ্বীনী শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রসার সাধন হলেও প্রকৃত তালেবে ইলম ও রব্বানী আলেমের অভাব বেড়ে চলছে। বেড়ে চলেছে দ্বীনি শিক্ষার সমস্যা এবং কদরও। আলেম-উলামার মানও দিনের দিন হ্রাস হয়ে চলেছে। মান বাড়ছে সেই সব শিক্ষার যার ফল হাতে হাতে পাওয়া যায়, যাতে আছে অধিক অর্থোপার্জনের উপায়। তাই যারা ইলমী মাদ্রাসার ছাত্র তাদেরও অধিকাংশ 'তালেবে ইলম' নয় বরং 'তালেবে মাল'।

যে জিনিসে মানুষের প্রয়োজন অধিক সেই জিনিসের মান ও মূল্য অধিক। যে সমাজে আলেমের প্রয়োজন নেই, আলেমের যথা মানের কর্ম নেই, চাকুরী নেই, যে সমাজে আলেমের প্রয়োজন আছে বলে লোকেরা অনুভবও করে না সে সমাজে আলেমের মূল্য কোথা হতে কে দেবে? কোথা হতে সচ্ছল ও সুন্দর হবে আলেমদের অর্থনৈতিক অবস্থা? যে দেশের লোক কাপড় পরে না, পরতে চায় না, পরার প্রয়োজন আছে বলে মনে করে না, অথবা পরলেও ময়লা কাপড় ধোয়ার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না অথবা কাপড় ধোয়ার জন্য ধোপার প্রয়োজন আছে বলে মনে করে না সে দেশে ধোপাদের অর্থনৈতিক মান কোথায় গিয়ে পৌঁছবে তা অনুমেয়।

বলাই বাহুল্য যে, এ কারণেই আলেমগণ অধিকাংশই গরীব। তালেবে ইলমরাও অধিকাংশ গরীবদের সন্তান। আর এজন্যই অনেকে এই দ্বীনী বিদ্যাকে 'ফকীরীবিদ্যা' বলে অভিহিত করে!

মাদ্রাসাগুলোতে আলেমের মত আলেম তৈরী না হওয়ার এটাও অন্যতম কারণ। কথায় বলে, 'কলম কালি মন, লিখে তিনজন।' দ্বীন শিখতে এসে যদি মন মানসিকতা ঠিক না থাকে, মনের ভিতরে যদি পেটের চিন্তা থাকে, সংসার ভার থাকে, পিতা-মাতা বা অন্যান্যের ভরণ পোষণের উপায় নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকে, সমাজের অবজ্ঞা ও ঘৃণার অনুভূতি থাকে, আত্মীয়-স্বজনের তিরস্কার ও ভর্ৎসনা থাকে তবে লিখা-পড়ার অন্যান্য উপকরণ সহজলভ্য হলেও যে ইলম আয়ত্ত করা সহজ নয়।

তাও অনুমেয়। বিশেষ করে যে শিশু বা অবোধ মনে তখনো আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল বদ্ধমূল হয় না; দ্বীনী সংগ্রাম তথা দ্বীনী জ্ঞান অর্জনের উৎসাহ-উদ্দীপনা তার মনে সৎসাহস যোগায় না। বিশেষ আগ্রহের সাথে সহযোগীতা করে না বহু ওস্তাদ ও অভিভাবকদের দল, সে সব ফুলের কুঁড়ি অথবা ফুটন্ত কুসুম দেখতে দেখতে ঝলসে যায়।

আলেমের হাতিয়ার হল কিতাব। যিনি আলেম অথচ তাঁর কিতাব নেই তিনি অনেকটাই পঙ্গু। কিন্তু ঐ দারিদ্রের কারণেই বহু আলেম ও তালেবে ইল্ম নিম আলেম থেকে যান। আগ্রহ, উদ্যম ও চেষ্টা সত্ত্বেও জ্ঞানভান্ডার সুরক্ষিত রাখতে তাঁরা সক্ষম হন না।

মানুষ তিক্তময় বহু জিনিষের স্বাদ গ্রহণ করে থাকে, কিন্তু দারিদ্রের মত অধিকতম তিক্ত স্বাদ হয়তো আর কিছু গ্রহণ করে না। শৈশবে ও কৈশরে যারা আমার মত ঈদের সকালে বিগলিত অশ্রুধারার অবাধ গতি রোধ করতে পারেনি, যারা অর্থাভাবে হাত না পেতে ক্ষুধা চাপা রেখে অনেক সময় শুষ্ক বমন দমন করতে পারেনি, দুঃসময়ে অতি প্রয়োজনে ঋণ করতে গিয়ে যারা ধনপতিদের নেতিবাচক জবাবে আঘাত খেয়ে চোখের পানিতে ফেরার পথ দেখতে পায়নি, যারা সামর্থ্যবান আত্মীয় ও ওস্তাদদের সাহায্য ও সহযোগিতায় একান্ত নিরাশ হয়ে মুষড়ে পড়েছে তারা জানে এ দরিদ্রতার তিক্ততা। অবশ্য রুজির মালিকের উপর যার পূর্ণ ভরসা থাকে সে কোনদিন লাঞ্ছিত হয় না। ধৈর্য ও স্থৈর্যের সাথে আল্লাহর ফরয পালনে (ইলম্ শিক্ষায়) নিবেদিত-প্রাণ থাকে। আল্লাহর নিকট অভাবের অভিযোগ করলে তিনিই সাহায্যের দায়িত্ব নেন।

একটি সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজী পত্রিকায় প্রশ্নোত্তরমূলক প্রতিযোগিতার আসরে এক প্রশ্ন ছিল, 'জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিক্ষা কিসের উপর নির্ভরশীল?' এর সঠিক উত্তরদাতার জন্য মূল্যবান পুরস্কারও ঘোষিত ছিল। অতঃপর সঠিক উত্তরদাতা হিসাবে পুরস্কৃত হয়েছিলেন এক প্রসিদ্ধ মহিলা সাহিত্যক। তাঁর উত্তর ছিল, 'জ্ঞান-বিজ্ঞান ইত্যাদি প্রতিভা উৎসাহ দানের উপর নির্ভরশীল।'

নতুন শিক্ষার্থীর হৃদয়-মনে সংকোচের বিহ্বলতা থাকা স্বাভাবিক। উৎসাহদানে দূরীভূত হয় সকল প্রকার বিহ্বলতা ও জড়তা। সৎসাহস প্রাপ্ত হলে ভীরুও জেগে উঠে। কেউ উদ্দীপনা দিলে অলস অকর্মণ্যও কাজে মনোবল পায়। তাই আমি, আপনি ও তাঁর প্রত্যেকেরই উচিত শিক্ষার্থী ও প্রতিভাধরকে উৎসাহিত করা।

আপনি যদি শিক্ষিত না হন এবং শিক্ষার্থীও না হন তবুও কোন শিক্ষার্থীকে উৎসাহদাতা হতে যেন ভুল করবেন না। কারণ, উৎসাহদানে প্রতিভাধরের প্রতিভার প্রতিভাত ঘটে। পক্ষান্তরে ব্যঙ্গ, উপহাস, অবহেলা ও উপেক্ষার কারণে প্রতিভার কুঁড়ি ফোটার আগেই ঝরে যায়।

এই পুস্তিকার অবতারণায় আমি সেই সকল মুকুলিত প্রতিভাধর তথা সকল শিক্ষার্থী ও তালেবে-ইলমকে এই বলে উৎসাহিত করতে প্রয়াস পেয়েছি যে,

"কুসুম কোরকে থেকো না বন্দী, থেকো না আর,
মধুর গন্ধে গন্ধবহ দিকে দিকে আজ কর প্রচার।"

পক্ষান্তরে কোন দ্বীনশিক্ষার্থী তালেবে-ইল্‌মকে কোন প্রকারে ইলমের পথে বাধা দেওয়ার অর্থ হল শয়তানকে খুশী ও জয়যুক্ত করা। কারণ, ইলম্‌ হল শয়তানের বিরুদ্ধে লড়বার হাতিয়ার। অতএব উক্ত নিরস্ত্রীকরণের অর্থই হল শয়তানকে দ্বীনের বিরুদ্ধে সহায়তা করা। সুতরাং আপনি মৌমাছি হয়ে যদি মধু বিতরণ না-ও করতে পারেন তবে যেন দয়া করে কাউকে হুল ফুঁড়বেন না।

আমার নিজস্ব ইলমী পরিসর স্বল্প ও সীমিত হলেও আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় বহু হতাশার অন্ধকারে ঘুর্ণায়মান তালেবে ইল্‌ম, ইলমের পথে লক্ষ্যহীন ভাবে বহু চলার পথিক এবং ব্যর্থতা ও নিরাশায় হারিয়ে যাওয়া বহু দ্বীনী ছাত্র আশার আলো পাবে বলে আমি মনে করি। যেমন বহু ছাত্র তাদের শিক্ষা ও কর্মজীবনে উদ্যম ও উৎসাহ পাবে, সলফে সালেহীনগণের ইল্‌মী পথের সন্ধান পাবে। আর -ইনশাআল্লাহ- পরিবর্তন আসবে তাদের নিয়তে যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি-বিধান ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে ও নিয়তে এই ইল্‌ম শিক্ষা করেছে বা করছে।

আল্লাহ প্রত্যেক আলেম, তালেবে ইল্‌ম ও তার অভিভাবকের নিয়তকে সৎ করুন। প্রত্যেক মুসলিমকে দ্বীনী ইল্‌ম শিক্ষা করার ফরয ও দায়িত্ব পালনে প্রেরণা দান করুন। আর সেই তওফীক দেন যাতে আমাদেরকে হাশর ময়দানে অন্ধ হয়ে না উঠতে হয়। আল্লাহুম্মা আমীন।

বিনীত-
আব্দুল হামীদ আল-ফায়যী
আল মাজমাআহ
সউদী আরব
মুহার্রাম ১৪১৪হিঃ

ইল্‌মের মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব

ইসলাম এক সর্বাঙ্গ-সুন্দর পূর্ণাঙ্গ দ্বীন। ইসলামের তরবিয়তও সর্বব্যাপী। জীবনের কোন দিকটাই ইসলাম উপেক্ষা করেনি। মানুষ যাতে সর্বাঙ্গসুন্দর 'মানুষ' হয়ে গড়ে উঠে তা ইসলামের অন্যতম লক্ষ্য। তাই, মানুষের দৈহিক উন্নতি সাধন এবং তার স্বাস্থ্য রক্ষার লক্ষ্যে ইসলামে রয়েছে দৈহিক তরবিয়ত। মানুষের ভাষা ও ভাবকে সুন্দররূপে প্রকাশ ও সংশোধনকল্পে ইসলামে রয়েছে ভদ্রতা ও সভ্যতার তরবিয়ত। মানুষের বুদ্ধিমত্তা ও চিন্তাশক্তিকে সঠিক ও উন্নত করার উদ্দেশ্যে রয়েছে মননশীলতার তরবিয়ত। বিশ্বের সাথে পরিচয় লাভ করার মানসে বিভিন্ন তত্ত্ব ও তথ্যের মাধ্যমে রয়েছে বৈজ্ঞানিক তরবিয়ত। জীবিকা অর্জনের বিভিন্ন পথনির্দেশের মাঝে রয়েছে পেশাদারী ও শিল্পিক তরবিয়ত। সমাজের অধিকার ও ব্যবহার সম্পর্কীয় নানা আইন-কানুনের পরিচয়দানের মাধ্যমে রয়েছে সামাজিক তরবিয়ত। বিশ্বভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় রাখতে এবং জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন করতে অনুপ্রাণিত করার মাধ্যমে রয়েছে মানবতার তরবিয়ত। মানুষের প্রকৃতি ও স্বভাবকে সুন্দর ও নির্মলরূপে গড়তে উদ্বুদ্ধকরণের মাঝে রয়েছে চারিত্রিক তরবিয়ত। রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ও শৃঙ্খলা সঠিকরূপে বজায় রাখতে নির্দেশদানের মাধ্যমে রয়েছে রাজনৈতিক তরবিয়ত। প্রভু ও বান্দার মাঝে সম্পর্ক দৃঢ় করতে রয়েছে আধ্যাত্মিক তরবিয়ত। মোট কথা ইসলামে রয়েছে সর্ব প্রকার কল্যাণকর ও চিরন্তন তরবিয়ত।

এ সকল তরবিয়তের সর্বশীর্ষে রয়েছে ইল্‌ম ও শিক্ষা। শিক্ষা হল তরবিয়ত ও ইবাদতের প্রথম ধাপ। তাই বিনা ইল্‌মে ইবাদত করলে অনেক ক্ষেত্রে ইবাদত বিদআতে পর্যবসিত হয়ে যায়। তাছাড়া সর্বাগ্রে যে ইল্‌ম জরুরী তার প্রতি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রয়েছে কুরাআনে মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াতে, আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ ﴾

অর্থাৎ- "সুতরাং জান যে, তিনি ব্যতীত কেউ সত্য উপাস্য নেই এবং তোমার ও বিশ্বাসী নারী-পুরুষদের ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর।" *(সূরা মুহাম্মাদ ১৯ আয়াত)* অবশ্য উক্ত আয়াতে একথারও স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে, যে বিষয় ও জ্ঞান সর্বাগ্রে শিক্ষনীয় তা হল তওহীদ ও আল্লাহ বিষয়ক জ্ঞান। আর এই জ্ঞান তথা শরীয়তের জ্ঞান শিক্ষাই হল প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয। *(বাইহাকী, তাবারানী প্রভৃতি, সহীহুল জামে'*

৩৯১৩ নং) কারণ অন্যান্য শিক্ষা না শিখলে বান্দার এমন কিছু আসে যায় না। কিন্তু এ শিক্ষা না শিখলে পরকালে তার মুক্তি নেই। আর ইহকালেও সমগ্র মানবমন্ডলীর জন্য মুক্তি ও শান্তির পথ এ শিক্ষা ছাড়া কল্পনাও করা যায় না।

মানুষ মারা গেলে তার জন্য আর কোন করণীয় আমল নেই, ইবাদত নেই। মধ্যজগতে সমগ্র নেকী ও সওয়াবের পথ বন্ধ থাকে। অবশ্য সে যদি জীবিতকালে কোন সাদ্‌কায়ে জারিয়া করে থাকে অথবা কোন ফলপ্রসূ ইল্‌ম ছেড়ে যায় অথবা তার জন্য দুআকারী নেক সন্তান ছেড়ে যায় তাহলে এসকল বিষয়ের সওয়াব ও উপকার সে সেই মধ্যজগৎ থেকেও লাভ করতে পারে। *(মুসলিম, আবূদাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, সঃ জামে' ৭৯৩ নং)* যেমন নেক সন্তান গড়তেও প্রয়োজন হয় ঐ কালজয়ী ইল্‌ম ও শিক্ষার।

এই সেই শিক্ষা, যার অন্বেষণের পথে চললে বেহেশ্তের পথে চলা হয়। আল্লাহ এমন শিক্ষার্থীর জন্য বেহেশ্তের পথ আসান করে দেন। *(মুসলিম, মিশকাত ২০৪)*

এই সেই শিক্ষা, যার তালেবের জন্য ফিরিশ্তাবর্গ নিজেদের ডানা বিছিয়ে থাকেন। তালেবে ইলমের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন; সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহায়তা করেন।

এই সেই জ্ঞান, যার জ্ঞানীর জন্য সমগ্র বিশ্বাবাসী (আকাশ ও পৃথিবীর সকল প্রকার বাসিন্দা) এমনকি পানির মাছ এবং গর্তের পিপড়াও ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে।

এই সেই শিক্ষা, যার শিক্ষিত ব্যক্তি আবেদ (অধিক নফল ইবাদতকারী) ব্যক্তি অপেক্ষা সেইরূপ শ্রেষ্ঠ যেরূপ রাত্রের আকাশে সমগ্র তারকামন্ডলী অপেক্ষা পূর্ণিমার চন্দ্র শ্রেষ্ঠ। বরং একজন সাধারণ সাহাবীর তুলনায় আল্লাহর রসূল ﷺ এর মান যেমন উচ্চে ঠিক তেমনিই আবেদের তুলনায় একজন আলেমের মান অনুরূপ উচ্চে। কারণ, আলেমরা হলেন আম্বিয়ার ওয়ারেস। সেই ইলমের ওয়ারেস যাতে রয়েছে জাতির জীবন। *(আবু দাউদ ৩৬৪১, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ২২৩, দারেমী, মিশকাত ২১২-২১৩ নং)*

তা ছাড়া প্রকৃত অবস্থা এই যে, আদর্শ মুসলিম হওয়ার গৌরব ও অধিকার যাঁরা লাভ করেছেন তাঁরা হলেন ঐ ইলমের অধিকারী খাঁটি আলেমরাই। ঐ ইল্‌ম বিষয়ে অজ্ঞ থেকে আসল মুসলিম হওয়ার দাবী করার কথা ভ্রান্ত নচেৎ মেকী। একথার সাক্ষ্য দিয়ে কুরআন বলে, ﴿ ﴾

অর্থাৎ- আল্লাহর বান্দাগণের মধ্যে উলামাগণই তাঁকে ভয় করে থাকে। *(সূরা ফাত্বির ২৮ আয়াত)*

এই সেই ইল্‌ম, যদ্দ্বারা আল্লাহ তাঁর বান্দাগণের মর্যাদা সুউন্নত করে থাকেন। *(সূরা মুজাদালাহ ১১ আয়াত)*

অন্ধ ও চক্ষুষ্মান সমান নয়, সমান নয় অন্ধকার ও আলো, ছায়া ও রৌদ্র। আর সমান নয় জীবিত ও মৃত।" *(সূরা ফাত্বির ১৯-২২আয়াত)* "যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান? বোধ-শক্তিসম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে থাকে।" *(সূরা যুমার ৯ আয়াত)*

এই সেই ইল্‌ম, যে ইলমের আলেমগণ সেই কথার সাক্ষি দেন; যে কথার সাক্ষি দেন স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর ফিরিশ্তাগণ। *(সূরা আ-লি ইমরান ১৮ আয়াত)*

এই সেই জ্ঞান, যে জ্ঞান বিষয়ে কেউ জিজ্ঞাসিত হওয়ার পর যদি সে তা গোপন করে তবে কিয়ামতের দিন তার নাকে আগুনের লাগাম পরানো হবে। *(আহমদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ২২৩নং)*

এই সেই বাঞ্ছিত ইল্‌ম, যা কেউ সংরক্ষণ ও প্রচার করলে তার মুখ উজ্জ্বল ও শ্রীবৃদ্ধি হয়। *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ২৩০ নং)*

এই সেই জ্ঞানভান্ডার যার উপর হিংসা করা বৈধ। *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত ২০২ নং)*

এই সেই নির্দেশমালা, যা না হলে মানুষ ভ্রষ্ট হয়ে যায়। বিভ্রান্তির ঘন অন্ধকারে শান্তির পথ খুঁজে পায় না। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ২০৬ নং)*

এমন ইল্‌ম যার পেটে নেই সে হতভাগা বৈ কি?

এই সেই ইল্‌ম যার প্রশংসায় জনৈক আরবী কবি বলেন,

অর্থাৎ- ইলমের অধিকারী ব্যক্তি হল চির জীবিত, মরণের পরও সে অমর। পক্ষান্তরে ইল্‌মহীন (মূর্খ) ব্যক্তি মাটির উপর চলাফেরা করলেও সে আসলে মৃত, তাকে জীবিত মনে করা হলেও আসলে সে অন্তর্হিত। *(সিয়ার আ'লামিন নুবালা ১৯/৫৩৩, টীকা নং ২)*

অর্থাৎ, আমি দেখেছি যে, ইলমের অধিকারী ব্যক্তি হলেন সম্ভ্রান্ত। যদিও তাঁর পিতামাতা নীচ বংশের হন। ইল্ম সর্বদা তাকে মর্যাদায় উন্নীত করতে থাকে। পরিশেষে সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ও তাঁর মর্যাদা উচ্চ করে থাকেন। তাঁরা তাঁর প্রত্যেক বিষয়ে অনুসরণ করে থাকেন; যেমন মেষপাল তার রাখালের অনুসরণ করে থাকে। তাঁর বাণী ও বক্তব্য দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়ে যায়। আর যিনি আলেম হন তিনিই ইমাম হন। যদি ইল্‌ম না হত তাহলে আত্মা সুখী হতো না এবং হালাল-হারাম চেনাও সম্ভবপর হতো না। ইলমের বদৌলতেই লাঞ্ছনা থেকে নিষ্কৃতি আছে, আর মূর্খতায় আছে অপমান ও অসম্মান। আলেম হন উন্নয়ন পথের পথপ্রদর্শক ও দিগ্‌দিশারী এবং তিনিই হন অন্ধকার মোচনকারী প্রদীপ। যে ইল্ম রসূল ﷺ হতে আগত। তাঁর উপর আল্লাহর তরফ হতে দরূদ ও সালাম বর্ষণ হোক। *(জামিউ বায়ানিল ইল্‌মি অফাযলিহ ১/৫৪)*
এই সেই ইল্‌ম, যে ইল্‌ম সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন,

:

অর্থাৎ, কুরআন, হাদীস এবং দ্বীনের ইলমে ফিক্‌হ ছাড়া যাবতীয় ইল্‌ম হল নিরর্থক। আসল ইল্‌ম হল সেই ইল্‌ম যাতে 'ক্বালা হাদ্দাসানা' বলা হয়। এ ছাড়া বাকী সর্বপ্রকার ইল্‌ম হল শয়তানের কুমন্ত্রণা। *(আলবিদায়াহ অন্নিহায়াহ ১০/২৫৪)*

অতএব হে তালেবে ইল্‌ম! এই ইল্‌ম নিয়ে তুমি ধন্য হও। গৌরব অর্জন কর ইহকালে ও পরকালে উক্ত ইলমের অধিকারী হয়ে। এই ইলমের পথে তোমাকে জানাই শত 'খোশ আমদেদ।' তোমাকে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করতে কবি বলেন,

বহুমূল্য পরিচ্ছদ, রতন ভূষণ,
নরের মাহাত্ম্য নারে করিতে বর্ধন।
জ্ঞান-পরিচ্ছদ আর ধর্ম অলংকার,
করে মাত্র মানুষের মহত্ত্ব বিস্তার।'

এ ছাড়া প্রিয় হাবীব ﷺ এর আরো কয়েকটি প্রেরণাদায়ক উপদেশ মনে রেখো; তিনি বলেন, "আল্লাহ যার জন্য কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন।" *(বুখারী, মুসলিম, ইবনে মাজাহ, সহীহ তারগীব ৬৪ নং)*

"(নফল) ইবাদত অপেক্ষা ইলমের মর্যাদা অধিক।" *(ত্বাবারানীর আউসাত্ব, সহীহ তারগীব ৬৫ নং)*

"দুনিয়া ও তন্মধ্যস্থিত সকল জিনিসই অভিশপ্ত, তবে আল্লাহর যিক্র ও তার আনুষঙ্গিক বিষয়, আলেম ও তালেবে ইল্ম (অভিশপ্ত) নয়।" *(তিরমিযী ইবনে মাজাহ, বাইহাকী, সহীহ তারগীব ৭০ নং)*

"যে ব্যক্তি কেবলমাত্র কিছু শিখা বা শিখানোর উদ্দেশ্যেই মসজিদে যায় সে ব্যক্তির জন্য পূর্ণ একটি হজ্জ্ পালন করার সমপরিমাণ সওয়াব লিপিবদ্ধ হয়।" *(ত্বাবারানীর কাবীর, হাকেম ১/৯১, সহীহ তারগীব ৮ ১নং)*

"যে ব্যক্তি কোন কল্যাণের প্রতি মানুষকে নির্দেশ দেয় সে ব্যক্তি ঐ কল্যাণ সম্পাদনকারীর ন্যায় সওয়াব অর্জন করে।" *(মুসলিম, আবূদাউদ, তিরমিযী প্রমুখ, সহীহ তারগীব ১১০ নং)*

আদর্শ আলেম কে?

ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, 'আলেম তিনিই যিনি আল্লাহকে ভয় করেন।' অতঃপর তিনি তাঁর এই বাণী পাঠ করেন যার অর্থ, "আল্লাহর বান্দাগণের মধ্যে ওলামাগণই তাঁকে ভয় করে।" *(সূরা ফাতের ২৮)*

সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ বলেন, 'আলেম তিনি নন যিনি অসৎ থেকে সৎকে চিনতে পারেন বা জানেন, বরং আলেম তিনিই যিনি সৎ জানেন অতঃপর তার অনুসরণ করেন।'

যায়েদ বিন আসলাম হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহ তাআলা বলেন, "আমি যাকে ইচ্ছা বহু মর্যাদায় উন্নত করি।" অর্থাৎ, ইল্ম দ্বারা। যেমন তিনি আরো বলেন, "আমি কতক নবীকে কতক নবীর উপর শ্রেষ্টত্ব দান করেছি।" অর্থাৎ ইল্ম দ্বারা।' *(সূরা আনআম ৮৩ ও সূরা ইসরা ৫৫)*

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ ﴾

অর্থাৎ, "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যাদেরকে ইল্ম দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে বহু মর্যাদায় উন্নত করবেন।" *(সূরা মুজাদিলাহ ১১ আয়াত)*

ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর ভাষ্যে বলেন, 'মুমিন (বিশ্বাসী)দের মধ্যে যাঁদেরকে ইল্ম দান করা হয়েছে তাঁদেরকে -যাঁদেরকে ইল্ম দান করা হয়নি তাঁদের উপর -আল্লাহ তাআলা মর্যাদায় উন্নত করবেন।'

এক মহিলা শা'বীকে সম্বোধন করে 'হে আলেম!' বললে তিনি বললেন, 'আলেম তো তিনিই যিনি আল্লাহকে ভয় করেন।'

মসরূক বলেন, 'ইলমের দিক থেকে মানুষের জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে সে আল্লাহকে ভয় করে এবং মূর্খতার দিক দিয়ে মানুষের জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, সে নিজের আমল দ্বারা গর্বিত হয়।'

সওরী বলেন, 'ওলামাগণ বিনষ্ট হলে কে তাঁদের সংশোধন করবে? আর তাঁদের বিনষ্ট; দুনিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়া বা বিষয়াসক্ত হওয়া। ডাক্তার যদি নিজের দেহে রোগ টেনে আনে তাহলে সে অপরের চিকিৎসা কি রূপে করবে?'

ফুযাইল বিন ইয়ায (রঃ) বলেন, 'আখেরাতের আলেম, যাঁর ইল্ম গুপ্ত। আর দুনিয়ার আলেম, যাঁর জ্ঞান বিক্ষিপ্ত। অতএব তোমরা আখেরাতের আলেমের অনুসরণ কর, আর দুনিয়ার আলেমের নিকট বসা থেকে সাবধান থাক। যেহেতু সে তার প্রতারণা, বাহ্যিক আড়ম্বর, বাকচাতুর্য ও বিনা আমলে ঝুটা ইলমের দাবী দ্বারা তোমাদেরকে বিঘ্নে নিপতিত করবে। আর আলেম তিনিই যিনি সত্যবাদী---।'

কিছু উলামা বলেন, 'অসৎ প্রকৃতির উলামা মানুষের পক্ষে ইবলীস অপেক্ষা অধিকতর ক্ষতিকর। যেহেতু ইবলীস যখন কোন মুমিনকে প্ররোচনা দেয় তখন সে জানতে পারে যে সে (শয়তান) তার প্রকাশ্য ভ্রষ্টকারী শত্রু। তাই তারপর সে গোনাহ থেকে সত্বর তওবা করে এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। পক্ষান্তরে অসৎ প্রকৃতির ওলামা বাতিল ও অন্যায়ভাবে মানুষকে ফতোয়া দান করে থাকে, কৃত্রিমতা, বিতর্ক ও বাক্চাতুরি দ্বারা নিজের প্রকৃতি ও খেয়াল-খুশী অনুযায়ী শরীয়তের অনুশাসনে সংযোজন ও অতিরঞ্জন করে থাকে। সুতরাং যে ব্যক্তি এমন উলামাদের অনুসরণ করে সে কর্ম ও আমলে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়। পার্থিব জীবনে যাদের প্রচেষ্টা পন্ড হয় অথচ তারা মনে করে যে, তারা নাকি সৎকর্ম করছে।

অতত্রব শত সাবধান এমন আলেম হওয়া থেকে, এমন আলেমের অনুসরণ জালে পতিত হওয়া এবং অন্ধভাবে তাতে আবদ্ধ হওয়া থেকে। উচিত হল, এমন আলেম হতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা এবং তাদের অনুসরণ ও অনুগমন থেকে নিজেকে বহু দূরে রাখা। আর সেই আলেমদের অনুসরণ ও সাহচর্য নির্বাচন ও অবলম্বন করা

যাঁরা প্রকৃতপক্ষে আদর্শ আলেম, সৎ ও সত্য আলেম।

সুফিয়ান সওরী (রঃ) বলেন, 'ইল্ম এজন্যই শিক্ষা করা হয় যাতে তার মাধ্যমে আল্লাহর ভীতি অর্জন করা যায়। ইল্মকে অন্যান্য থেকে শ্রেষ্ঠত্ব এই জন্য দান করা হয়েছে যে, তার মাধ্যমে আল্লাহকে ভয় করা হয়।'

বিশ্‌র বিন হারেস (রঃ) বলেন, 'ইল্ম অনুসন্ধান করা বিষয়াসক্তি হতে পলায়ন করার প্রতি নির্দেশ করে, বিষয়-লালসার প্রতি নয়। বলা হত যে, সর্বাপেক্ষা উচ্চ মর্যাদার আলেম তিনিই, যিনি তাঁর দ্বীন নিয়ে দুনিয়া হতে পলায়ন করেন এবং খেয়াল-খুশীর উপর যাঁকে পরিচালিত করা সহজ নয়।'

আলেম যদি তার ইলম্‌ অনুসারে আমল না করেন তবে নিশ্চয় তিনি ঘৃণার্হ, আল্লাহর নিকটেও শাস্তিযোগ্য। কথিত আছে যে, আল্লাহ হযরত দাউদ (আঃ) এর প্রতি প্রত্যাদেশ করে বললেন, 'হে দাউদ! তুমি আমার ও তোমার মাঝে কোন দুনিয়াদার বিষয়াসক্ত লোভী আলেমকে উপস্থিত করো না, নচেৎ সে তোমাকে আমার প্রেমের পথে প্রতিহত করবে। কারণ ওরা আমার ভক্ত বান্দাদের পথে দস্যুদলের মত। আমি ওদেরকে ন্যূনতম শাস্তি এই প্রদান করব যে, ওদের হৃদয় হতে মুনাজাতের মিষ্টতা ছিনিয়ে নেব।' *(জামেউ বায়ানিল ইলমি অফাযলিহ ১/১৯৩)*

ফুযাইল বিন ইয়ায ও আসাদ বিন ফুরাত হতে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, 'আমাদের নিকট পৌঁছেছে যে, কিয়ামতের দিন মূর্তিপূজকদের পূর্বে ফাসেক কুরআন পাঠকারী ক্বারী ও আলেমদের হিসাব গ্রহণ করা হবে।' ফুযাইল বলেন, 'যেহেতু যে জানে, সে তার মত নয় যে জানে না।'

আবুল আলিয়াহ বলেন, 'মানুষের উপর এমন এক যুগ আসবে যখন কুরআন হতে তাদের হৃদয় পতিত হয়ে যাবে। তার কোন মাধুর্য ও স্বাদ তারা পাবে না। যা করতে তাদেরকে আদেশ করা হয়েছে তা না করে তারা (অলস আশাবাদী হয়ে) বলবে, 'আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াবান।' আর যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে তা করে তারা বলবে, 'আমাদেরকে আল্লাহ মাফ করে দেবেন, আমরা তো আল্লাহর সহিত কিছুকে শরীক করিনি!' তাদের সমস্ত বিষয়ই লালসাময় হবে, যার সহিত কোন সততা থাকবে না। তারা নেকড়ের মনের উপর মেষের চর্ম পরিধান করবে। ধর্মে তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হবে সেই ব্যক্তি যে হবে তোষণকারী।'

নবী ﷺ কে সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, "(সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ হল) উলামা, যখন তারা বিনষ্ট ও কর্তব্যচ্যুত হয়ে যায়।"

(জামেউ বায়ানিল ইল্ম অফাযলিহ ১/১৯৩)

হযরত ওমর (রাঃ) হযরত কা'ব (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'স্মৃতিস্থ ও আয়ত্ত করার পর ওলামাদের হৃদয় থেকে ইল্মকে কোন বস্তু অপসারিত করে? তিনি বললেন, 'লোভ এবং উপর্যুপরি মানুষের নিকট প্রয়োজন যাচনা করা ইল্ম দূর করে ফেলে।'

মিকরায বিন অবারাহকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'সৎলোক কখন অসৎ ও ঘৃণার্হ হয়?' তিনি বললেন, 'বান্দা আখেরাতপ্রেমী হয়ে অতঃপর যখন দুনিয়াপ্রেমী হয়।'

বিশ্র বিন হাকাম বলেন, 'আমি সুফিয়ানকে বলতে শুনেছি যে, 'কোন বান্দা যখন ইল্ম অধিক অর্জন করে, অতঃপর সে পার্থিব আগ্রহ ও আসক্তি জমায় তখন সে আল্লাহর নিকট হতে অধিক দূরে সরে যায়।'

আর একথা ধ্রুব সত্য যে, যে ব্যক্তি আল্লাহকে জানা ও চেনার পর তাঁর অবাধ্যতা ও অন্যথাচরণ করার দুঃসাহস করে সে ব্যক্তির অপরাধ ও শাস্তি ঐ ব্যক্তির মত নয় যে তাঁকে জানে না অথবা উত্তম রূপে চেনে না। অবশ্যই জ্ঞানপাপীর অপরাধ বৃহৎ এবং তার শাস্তিও অনুরূপ।

ইখলাস

আহলে ইল্ম, আলেম, মুদার্রিস বা তালেবে ইল্মের উচিত, তিনি যে বুনিয়াদের উপর ভিত্তি করে তাঁর সর্বকাজ করবেন তা যেন পুরো ইখলাসপূর্ণ হয়। এই ইল্মের গোড়ায় নিয়ত রাখবেন যে, তিনি এর দ্বারায় একমাত্র আল্লাহর তুষ্টি বিধান চান, এই ইবাদতের দ্বারা অন্যান্য ইবাদত সঠিকভাবে আদায় করে তাঁর সামীপ্য চান। যে ইবাদত (ইল্ম তলব করা) সবচেয়ে বড়, পূর্ণতাপ্রাপ্ত, মঙ্গলময় ও উপকারী। সকল প্রকার ছোট ও বড় কাজে এই অমূল্য ও মযবুত বুনিয়াদের কথা স্মরণ রাখবেন। শিক্ষা ও শিক্ষকতার সময়, বাহাস ও মুনাযারার সময়, লিখন ও বক্তৃতার সময়, ওয়ায ও নসীহত করার সময়, হিফ্য ও আলোচনা করার সময়, ইলমী মজলিসে বসার সময়, অথবা তার প্রতি পদার্পণের সময়, কিতাব অথবা অন্যান্য ইলমের উপকরণ ক্রয় করার সময়, তাঁর অন্তস্তলে যেন একমাত্র আল্লাহর জন্য ইখলাস বিদ্যমান থাকে। নেকী ও সওয়াব হাসিলের নিয়ত থাকে। যাতে সকল প্রকার ব্যাপৃতি ও ব্যস্ততা আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতে পরিণত হয়। আল্লাহ ও তাঁর জান্নাতের জন্য বিচরণ হয় এবং প্রিয় নবী ﷺ এর এই বাণীর দৃষ্টান্ত হয়, "যে ব্যক্তি এমন পথে চলে যাতে সে

ইল্‌ম অন্বেষণ করে। আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের প্রতি চলার পথ সহজ করে দেন। *(মুসলিম)*

বিচরণ অথবা আচরণের পথ; সকল পথই আহলে ইল্‌মগণ যাতে ইল্‌মের খাতিরে চলেন -তা এই হাদীসে উদ্দিষ্ট হয়েছে।

পক্ষান্তরে আল্লাহর সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ইলম তলব করা এক ভয়ঙ্কর বিপদ, যা একপ্রকার শির্ক। তাই সাবধান! যাতে ঐ ইল্‌ম অর্জন কোন মন্দ উদ্দেশ্যে; গর্ববোধ, বিতর্কপ্রীতি, লোক প্রদর্শন, সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জন, নেতৃত্ব ও পদলাভ, সম্পদ ও অর্থোপার্জন, কোন সম্ভ্রান্তাকে বিবাহ করা প্রভৃতি উদ্দেশ্যে না হয়, কারণ এই লক্ষ্য তাঁদের হতে পারে না যাঁরা প্রকৃত আহলে ইল্‌ম ও উলামা। আর যাঁরা ঐসব উদ্দেশ্যের কোন এক কারণে ইল্‌ম অর্জন ও বিতরণ করে থাকেন তাঁদের জন্য আখেরাতের কোন অংশ নেই।

ইমাম নাসাঈ আবূ উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত করেছেন যে, 'এক ব্যক্তি নবী ﷺ এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, 'এমন এক ব্যক্তি প্রসঙ্গে আপনার অভিমত কি, যে সওয়াব ও খ্যাতিলাভের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে? তার জন্য কি?' উত্তরে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি বললেন, "যে কর্ম আল্লাহর জন্য বিশুদ্ধ হয় এবং যদ্দ্বারা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করা হয় তা ছাড়া তিনি কোন কর্মকে কবুল (গ্রহণ) করেন না।' *(নাসাঈ ২/৫৯)*

ইমাম আবুদাউদ আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! এক ব্যক্তি জিহাদ করতে চায়, কিন্তু সে তাতে পার্থিব কোন স্বার্থ কামনা করে।' রসূল ﷺ বললেন, "তার জন্য কোন সওয়াব নেই।" লোকটি ঐ একই কথা তিনবার ফিরিয়ে বলল। নবী ﷺ প্রত্যেক বারেই উত্তরে বললেন, "তার জন্য কোন সওয়াব নেই।"

রসূল ﷺ বলেন, "এই উম্মতকে অভ্যুদয়, দেশসমূহে ক্ষমতা, স্থিতি, বিজয়লাভ এবং দ্বীনের মধ্যে সুউচ্চ মর্যাদার সুসংবাদ দাও। আর তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি পরকালের কর্মকে মাধ্যম করে ইহকাল দুনিয়ার উদ্দেশ্যে কোন কর্ম করবে তার জন্য পরকালের কোন অংশ নেই। *(মুসনাদে আহমদ ৫/১৩৪)*

তিনি বলেন, "আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'আমি সকল অংশীদার অপেক্ষা অধিক শির্ক (অংশীদারী) হতে বেপরোয়া। অতএব যে ব্যক্তি আমার জন্য কোন এমন আমল করবে যাতে সে আমি ভিন্ন অন্য কাউকে অংশী করবে আমি তার থেকে সম্পর্কহীন। আর সে আমল তার জন্য হবে যাকে সে শরীক করেছে।" *(মুসলিম, ইবনে মাজাহ)*

যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, "সুতরাং যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ আশা করে সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার প্রভুর ইবাদতে কাউকেও শরীক না করে।" *(সূরা কাহফ ১১০ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন, "তারা কেবল একনিষ্ঠভাবে বিশুদ্ধ-চিত্তে আল্লাহর ইবাদত করতেই আদিষ্ট হয়েছিল।" *(সূরা বাইয়্যেনাহ ৫ আয়াত)*

সুতরাং প্রত্যেক ইবাদত ও আমলের ইচ্ছা, উদ্দেশ্যে ও সংকল্পে ইখলাস বা আল্লাহরই জন্য বিশুদ্ধচিত্ততা একান্ত আবশ্যক। ইবনুল কাইয়্যেম (রঃ) বলেন, 'যেরূপ তিনি একক উপাস্য, তিনি ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই। ঠিক তদনুরূপই ইবাদত ও উপাসনা শরীকবিহীনভাবে একমাত্র তাঁরই উদ্দেশ্যে হওয়া উচিত। অতএব যেমন তিনি তাঁর উপাস্যত্বে একক ঠিক তেমনই তাঁকে তাঁর ইবাদতে একক মানা সকলের জন্য ওয়াজেব। তাই নেক আমল বা সৎকর্ম সেই আমল বা কর্মকে বলে যা লোকপ্রদর্শন থেকে বিশুদ্ধ এবং সুন্নাহর অনুবর্তী হয়।'

উপরোক্ত দুটি শর্তই গ্রহণযোগ্য আমলের দুই স্তম্ভ। আমল সঠিক ও বিশুদ্ধ হওয়া একান্ত আবশ্যক। আর তা সঠিক তখনই হবে যখন সুন্নাহর নির্দেশিত রীতি-নীতি ও পদ্ধতির অনুসারে তা করা হবে। যেমন আল্লাহ তাআলার এই বাণী "সে যেন সৎকর্ম করে" তে এর প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। আর বিশুদ্ধ তখন হবে যখন আমল প্রকাশ্য ও গুপ্ত শির্কের ভেজাল থেকে নির্মল ও খাঁটি হবে। যার প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলেন, "এবং তার প্রভুর ইবাদতে কাউকেও (যেন) শরীক না করে।" *(তাইসীরুল আযীযিল হামীদ ৫২৫ পৃঃ)*

সুতরাং তালেবে ইল্মের উচিত। তার নিয়ত ও উদ্দেশ্যকে ইল্ম সন্ধানে শুদ্ধ ও সৎ করা। আর ইল্ম অন্বেষণে সৎ বা নেক নিয়ত তখন হয় যখন তাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা হয় এবং তার (ইল্ম) দ্বারা আমল করা, শরীয়তকে জীবন্ত ও সংস্কার করা, নিজের অন্তঃকরণকে জ্যোতির্ময় করা, নিজের অভ্যন্তরকে পরিশুদ্ধ করা, সমাজের মূর্খতা দূরীভূত করা, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভ করা, আল্লাহর অনুগ্রহ এবং তাঁর প্রস্তুত রাখা জান্নাতের অধিকারী হওয়া ইত্যাদির আশা পোষণ করা হয়।

অর্থাৎ, এই ইল্ম অনুসন্ধানে পার্থিব কোন স্বার্থলাভ, পদ, মর্যাদা, খ্যাতি, যশ ও অর্থলাভ, সমকালীন ওলামাদের সহিত পরস্পর গর্ব ও বড়াই করা, মানুষের নিকট সম্মান পাওয়া, বিভিন্ন বৈঠকে ও জালসায় আমন্ত্রিত হওয়ার লালসা প্রভৃতি উদ্দেশ্য

ও লক্ষ্য না হয়। নচেৎ নিকৃষ্টতর বস্তুকে উৎকৃষ্টতর বস্তুর পরিবর্তে বিনিময় করে নেওয়া হবে।

বলা বাহুল্য, এই নিয়ত ও উদ্দেশ্যকে সৎরূপে নিশ্চিত ও স্থির রাখা খুবই কঠিন কাজ। সুফিয়ান সওরী (রঃ) বলেন, 'নিয়ত অপেক্ষা কোন কঠিনতর বস্তুর উপর আমি সাধনা করিনি।'

সহল (রঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হল, 'আত্মার উপর সবচেয়ে কঠিন বস্তু কি? বললেন, 'ইখলাস।'

ইউসুফ বিন হুসাইন বলেন, 'দুনিয়ার মধ্যে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান বস্তু ইখলাস। আমি আমার অন্তর থেকে রিয়া (লোকপ্রদর্শন) দূর করার উপর কত প্রচেষ্টা ও প্রযত্ন করি তবুও তা যেন অন্য এক রঙে উদ্গত হয়।'

আবু সুলাইমান বলেন, 'বান্দা যখন কর্মে ইখলাস আনয়ন করে তখন তার নিকট হতে সকল প্ররোচনা এবং লোকপ্রদর্শনের উদ্দেশ্য দূরীভূত হয়ে যায়।'

আল হিরাবী বলেন, 'ইখলাস প্রত্যেক ভেজাল হতে আলেমের জন্য নির্মলতা।'

ইবনুল কাইয়্যেম বলেন, 'অর্থাৎ মুখলিসের আমল আত্মার কামনার সর্বপ্রকার ভেজাল থেকে পবিত্র ও বিশুদ্ধ হয়; সৃষ্টির হৃদয়ে সুন্দর ও সুশোভিত হতে চাওয়া, তাদের প্রশংসা কামনা করা এবং দুর্নাম থেকে বাঁচার উদ্দেশ্য রাখা, তাদের সম্মান ও ভক্তি লুটার আকাঙ্খা করা, তাদের মাল, খিদমত বা সেবা অথবা প্রেম ও ভালবাসার আশা করা, তাদের মাধ্যমে নিজের কার্যসিদ্ধি করার ইচ্ছা পোষণ করা ইত্যাদি ব্যাধি ও ভেজাল থেকে তার আমল ও কর্ম মুক্ত ও পরিশুদ্ধ হয়। যার সমষ্টি উদ্দেশ্য হচ্ছে, তার আমল দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা ছাড়া অন্য কিছু কামনা হয় না।

মুত্বার্রিফ বিন আব্দুল্লাহ বলেন, 'রাত্রি জাগরণ করে ইবাদত করে সকালে আত্মপ্রশংসা অনুভব হওয়া অপেক্ষা সারা রাত্রি নিদ্রায় অতিবাহিত করে সকালে লাঞ্ছিত হওয়া আমার নিকট অধিক প্রিয়।'

আবু ইউসুফ (রঃ) বলেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের আমল দ্বারা আল্লাহকে চাও। যেহেতু যখনই আমি কোন মজলিসে বসে বিনীত হওয়ার উদ্দেশ্য রাখি তখনই আমি তাদের সর্বোপরি না হয়ে উঠি না। আর যখনই আমি কোন মজলিসে বসে তাদের সর্বোপরি হওয়ার উদ্দেশ্য রাখি তখনই আমি অপমানিত হয়ে উঠি।'

হলে তা গ্রহণ করা হয়, পবিত্র করা হয় এবং তার প্রাচুর্য বৃদ্ধি পায়। আর যদি তার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি-বিধান ব্যতীত অন্য কিছু উদ্দেশ্য হয় তাহলে তা বিফল হয়, নষ্ট হয়ে যায় এবং তার ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সম্ভবতঃ অন্যান্য উদ্দেশ্যও সফল বা পূরণ হয় না। ফলে তার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ এবং প্রচেষ্টা নিস্ফল হয়। *(তাযকিরাতুস সামে' অল মুতাকাল্লিম ৬৮পৃঃ)*

উপরোক্ত উক্তিসমূহকে একত্রিত করে রসূলুল্লাহ ﷺ এর হাদীস, যাতে তিনি বলেন, "মানুষের মধ্যে কিয়ামতে সর্বপ্রথম যে ব্যক্তির মীমাংসা করা হবে সে হল এমন ব্যক্তি, যে শহীদ হয়েছে। তাকে আনা হবে, আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহসমূহকে তার নিকট পরিচিত করবেন। লোকটি তা চিনে নেবে। আল্লাহ বলবেন, 'তুমি তাতে কি আমল করেছ?' সে বলবে, 'আমি আপনার পথে লড়াই লড়ে শহীদ হয়েছি।' তিনি বলবেন, 'মিথ্যা বললে তুমি। বরং তুমি এই জন্যই লড়াই লড়েছ যাতে তোমাকে বীর দুঃসাহসিক বলা হয়। আর তা বলাও হয়েছে।' অতঃপর তাকে তার মুখমন্ডলের উপর ছেঁচড়ে আকর্ষণ করে দোযখে নিক্ষিপ্ত করতে আদেশ করা হবে।

দ্বিতীয় এমন ব্যক্তি যে ইল্ম শিখেছে, অপরকে শিক্ষা দিয়েছে এবং কুরআন পাঠ করেছে। তাকে আনা হবে। আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহসমূহকে তার নিকট পরিচিত করবেন, সে তা চিনতে পারবে। তিনি বলবেন, 'ওতে কি আমল করেছ?' সে বলবে, 'আমি ইলম শিক্ষা করেছি এবং অপরকে তা শিক্ষা দিয়েছি, আর তোমার উদ্দেশ্যে কুরআন পাঠ করেছি।' বলবেন, 'তুমি মিথ্যা বললে। বরং তুমি এ জন্যই ইল্ম শিক্ষা করেছিলে যে, তোমাকে 'আলেম' বলা হবে, আর কুরআন পাঠ করেছিলে যাতে তোমাকে 'ক্বারী' বলা হবে। আর তা তো বলাও হয়েছে।' অতঃপর তাকে তার মুখমন্ডল ছেঁচড়ে টেনে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে আদেশ দেওয়া হবে।

তৃতীয় এমন এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ প্রাশ্যস্ত দান করেছেন এবং সমস্ত প্রকার সম্পদ তাকে প্রদান করেছেন। তাকে আনা হবে। আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহসমূহকে তাঁকে চিনাবেন, সে চিনে নেবে। বলবেন, 'তাতে তুমি কি আমল করেছ?' সে বলবে, 'যে পথে আপনি দান করা পছন্দ করেন আমি প্রত্যেক সেই পথেই আপনার উদ্দেশ্যে দান করেছি।' তিনি বলবেন, 'তুমি মিথ্যা বললে। বরং তুমি এরূপ করেছ, যাতে তোমাকে 'দানশীল' বলা হয়, আর তা বলাও হয়েছে। অতঃপর তাকে তার মুখ ছেঁচরে টেনে নিয়ে গিয়ে দোযখে নিক্ষেপ করতে আদেশ করা হবে।" *(মুসলিম)*

সুতরাং আল্লাহর রসূল ﷺ এর উক্ত হাদীস একথাই অবধারিত করে যে, তালেবে ইলমের জন্য ইলমের সন্ধানে তার নিয়তকে বিশুদ্ধ করা অত্যাবশ্যক। অতএব তার জ্ঞানশিক্ষা যেন কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি-বিধানের উদ্দেশ্যে হয়। ইল্ম অন্বেষণে কেবল তাঁরই অনুগ্রহ ও সওয়াব অর্জন লক্ষ্য হয়। আর মানুষের চোখে বড় হওয়া, তাদের ঘাড়ে চড়া বা কাঁধে উঠার উদ্দেশ্য যেন কোন ক্রমেই না হয়। যেহেতু রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি ইল্ম অনুসন্ধান করে এই উদ্দেশ্যে যে, সে তার দ্বারা উলামাদের সহিত বড়াই করবে, নির্বোধদের সহিত বিতর্ক করবে অথবা তার প্রতি সকল মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে -তাহলে সে দোযখবাসী হবে।" *(ইবনে মাজাহ, সহীহ তারগীব অত্তারহীব)*

বিষয়াসক্তি

পূর্বে একাধিকবার আলোচিত হয়েছে যে, দ্বীনকে ফাঁদ বানিয়ে দুনিয়া শিকার করা বা দ্বীনকে পার্থিব কোন সম্পদ উপার্জনের অসীলা ও মাধ্যম করা কোন তালেবে ইল্ম বা আলেমের জন্য বৈধ নয়। যেমন কোন সাধারণ মানুষের জন্যও দ্বীনকে জাল বানিয়ে কোন স্বার্থের মাছ শিকার করা অবৈধ। ইল্ম শিক্ষা করা দ্বীনের অংশ। তাই একেও কোন স্বার্থের বাহন করা আদৌ উচিত নয়। নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন এমন ইল্ম অন্বেষণ করে যার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশা করা হয়, যদি তা সে কেবলমাত্র পার্থিব সম্পদলাভের উদ্দেশ্যেই অন্বেষণ করে তবে সে কিয়ামতের দিন জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না।" *(আবু দাউদ, আহমদ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান)*

ইবনে রজব এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, 'এই হাদীসের পটভূমিকা এই যে, -আর আল্লাহই অধিক জানেন- পৃথিবীতে ত্বরান্বিত এক জান্নাত আছে এবং তা হচ্ছে আল্লাহর মা'রেফাত (পরিচিতি); তাঁর ভালোবাসা, তাঁর যিকরে নিরুদ্বেগ অর্জন, তাঁর সাক্ষাতের বাসনা, তাঁর ভীতি, আনুগত্য ইত্যাদি। ফলপ্রসূ ইল্ম এর প্রতি নির্দেশ করে। অতএব যার ইল্ম পৃথিবীর এই ত্বরান্বিত বেহেশ্তে প্রবেশ করতে নির্দেশ করে সে পরকালের বেহেশ্তে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি পৃথিবীর এই জান্নাতের সৌরভ পায় না সে ব্যক্তি পরকালের জান্নাতের সৌরভ-ঘ্রাণ পাবে না। এই জন্যই আখেরাতে সবচেয়ে অধিক শাস্তিযোগ্য হবে সেই আলেম যার ইল্ম দ্বারা আল্লাহ তাকে উপকৃত করেননি এবং সেই হবে কিয়ামতের দিন অধিকতম আক্ষেপকারী। যেহেতু তার নিকট এমন যন্ত্র ছিল যার সাহায্যে সে সর্বাপেক্ষা সুউচ্চ মর্যাদা ও উন্নত স্থানে

পৌঁছতে পারত, কিন্তু সে তা (তাতে ব্যবহার না করে) কেবলমাত্র সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট, তুচ্ছ এবং নগণ্য বিষয়ে ব্যবহার করেছে। সুতরাং সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় হয়েছে যে ব্যক্তির নিকট মূল্যবান উৎকৃষ্ট মণি-মুক্তা ছিল কিন্তু তা বিষ্ঠা বা কোন মূল্যহীন নোংরা বস্তুর বিনিময়ে বিক্রয় করে ফেলেছে। এই অবস্থা তার, যে নিজের ইল্‌ম দ্বারা পার্থিব সম্পদ অন্বেষণ করে।'

পূর্বে উল্লেখিত এক হাদীসে বলা হয়েছে, "যে ব্যক্তি আখেরাতের কর্ম দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে করবে তার জন্য আখেরাতের কোন ভাগ থাকবে না।" *(আহমদ)*

এই হাল তাঁদেরও যারা দ্বীনকে বাহন করে কোন তাগুতের সংসদের সভ্য অথবা কোন পদস্থ নেতা হওয়ার আকাঙ্খা পোষণ করে থাকেন।

অনুরূপ সেই 'ক্বারী' ও হাফেযের দল; যাঁরা কেবল মাত্র অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে ক্বিরআত ও হিফ্য করেন এবং অপরকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। যেহেতু হাদীসে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষাদানের উপর একটি ধনুকও গ্রহণ করবে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার পরিবর্তে জাহান্নামের আগুনের ধনুক তার গলায় লটকাবেন।" *(সহীহুল জামে' ৫৯৮২নং)*

তদনুরূপ ঐ প্রকার ভারাটে ক্বারী ও হাফেয যাঁরা কুরআন কারীমের অর্থ বোঝেন না, কুরআন প্রচারের উদ্দেশ্যে কাউকে তা বুঝাতেও পারেন না, ইবাদতের নিয়তে পাঠও করেন না অথচ কোন ডাক এলে খতম পড়ার জন্য 'হায়ার' যেতে কুণ্ঠাবোধ না করে গর্ববোধ করেন। যেমন সেই দ্বীনি বক্তারও এই অবস্থা, যিনি বক্তৃতাকে ভাড়া খাটিয়ে সমাজের অর্থ লুটে বেড়ান। যার অন্তঃসারশূন্য বক্তৃতায় না কোন ইখলাস থাকে, না দ্বীন প্রচারের নিয়ত। অপরকে সৎকার্যের আদেশ দেন, কিন্তু তাঁর নিজের জীবনে পূর্ণ দ্বীন বাস্তব করেন না। কথায় আস্ফালন ও মাধুর্য থাকলেও কর্মে তিনি যত্নবান নয়।

যেমন সেই মুদার্রিস যিনি বহু ছাত্রকে দর্স্ দিয়ে ফারেগ করেছেন কিন্তু নিজের কোন ছেলে-মেয়েকে পূর্ণ মুসলিম করতে চেষ্টা করেন নি। কেউ সঠিকমত পড়ছে বা শিখছে কিনা তা তাঁর চিন্তার বিষয় নয়, বরং তাঁর চিন্তার বিষয় হল, মাসের ৩০ তারীখ আর কয় দিন পর?!

এমন লেখকদের কথাও বলা যায়। যাঁরা দ্বীন প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে পাঠকের দুনিয়ায় প্রসিদ্ধ হয়েছেন। কিন্তু তাঁদের সেই লিখায় প্রকৃত প্রাণ থাকে না যার দ্বারা কাল

পরিণামে কাল তাঁদের চেহারা কালো হয়ে যাবে। কারো বা উদ্দেশ্য থাকে, লেখার ময়দানে প্রতিযোগিতা, অথবা ভাষার বহর, অথবা সাহিত্যিক রচনাশৈলী ও প্রতিভা প্রদর্শন, অর্থোপার্জন বা খ্যাতি লুণ্ঠন, অথবা কারো সম্ভ্রম অপহরণ ইত্যাদি। এঁদের জন্য আখেরাতে কি কোন অংশ আছে? আর এঁদের দ্বারায় কি সমাজ উপকৃত হবে?

পক্ষান্তরে মহান আল্লাহ তাঁর আদর্শ নবীকে সম্বোধন করে বলেন,

﴿ ﴾

অর্থাৎ, বল, আমি উপদেশের উপর তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাই না এবং আমি লৌকিকতাকারীদেরও অন্তর্ভুক্ত নই। *(সূরা স্বা-দ ৮৬ আয়াত)*

আবু সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "তোমরা কুরআন শিক্ষা কর এবং তদ্দ্বারা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা কর, তাদের পূর্বে পূর্বে যারা কুরআন শিক্ষা করে তদ্দ্বারা দুনিয়া যাচনা করবে। যেহেতু কুরআন তিন ব্যক্তি শিক্ষা করে; প্রথমতঃ সেই ব্যক্তি যে তার দ্বারা বড়াই করবে। দ্বিতীয়তঃ সেই ব্যক্তি যে তার দ্বারা উদরপূর্তি করবে এবং তৃতীয়তঃ সেই ব্যক্তি যে কেবল আল্লাহর উদ্দেশ্যে তেলায়ত করবে।' *(আবু উবাইদ, হাকেম)*

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) বলেন, 'কি করবে তোমরা-যখন তোমাদেরকে এমন ফিতনা গ্রাস করবে, যাতে শিশু প্রতিপালিত হবে এবং বড় বৃদ্ধ হবে। (অর্থাৎ ঐ ফিতনা সকলের আচরণ ও অভ্যাসে পরিণত হবে।) যখন অভিনব রচিত (বিদআতকে) সুন্নাহরূপে গ্রহণ ও ধারণ করা হবে; যার উপরে মানুষ চলবে। যদি তার কিছু অপসারণ করা হয় তো বলা হবে, 'সুন্নাহ অপসৃত হয়ে গেল।' বলা হল, 'এরূপ কখন হবে? হে আবু আব্দুর রহমান!' বললেন, 'যখন তোমাদের ক্বারীর সংখ্যা বেশী হবে, ফকীহ (প্রকৃত জ্ঞানী ও তত্ত্ববিদ আলেম) কম হবে, তোমাদের আমানতদার অল্প হয়ে যাবে, আখেরাতের কর্ম দ্বারা দুনিয়া সন্ধান করা হবে এবং দ্বীনী ইল্‌ম আমল ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে শিক্ষা করা হবে।'

বর্তমান যুগে সেই ফিতনা প্রতীয়মান। আলেমে-আলেমে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রতর্ক, বিবাদ, কখনো বা দলাদলি ও হানাহানি দৃশ্যমান হয় এই ফিতনার কারণেই। যার কারণে সমাজের বুকে আলেমের মানও কমে গেছে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'যদি ইল্‌ম বহনকারীরা যথার্থরূপে নিষ্ঠার সাথে তা বহন করত তাহলে আল্লাহ, তাঁর ফিরিশ্তামন্ডলী এবং সৎ লোকেরা তাদেরকে ভালোবাসতেন। আর লোকেরাও তাদেরকে সমীহ ও ভয় করত। কিন্তু তারা ইল্‌ম দ্বারা পার্থিব স্বার্থ সন্ধান করেছে।

যার ফলে আল্লাহ তাদেরকে ঘৃণ্য করেছেন এবং তারা লোকেদের নিকট অবজ্ঞা ও অসম্মানের পাত্র হয়ে গেছে।'

মায়মূন বিন মিহরান বলেন, 'হে কুরআন ওয়ালারা! তোমরা কুরআনকে বেসাতিরূপে গ্রহণ করো না; যার দ্বারা দুনিয়াতে লাভ ও স্বার্থ খুঁজে বেড়াবে। বরং দুনিয়া দ্বারা দুনিয়াকে এবং আখেরাত দ্বারা আখেরাতকে অন্বেষণ কর। কেউ তো বিতর্ক করার জন্য কুরআন শিক্ষা করে, কেউ বা লোকে তার দিকে ইঙ্গিত করবে (প্রসিদ্ধ হবে) এই লোভে শিক্ষা করে। আর সেই ব্যক্তি উত্তম যে তা শিক্ষা করে এবং তাতে আল্লাহর আনুগত্য করে।'

বিশ্‌র বিন হারেস (রঃ) বলেন, 'পূর্বের উলামাগণ তিন গুণে গুণান্বিত ছিলেন। সত্যবাদিতা, হালালখোরী এবং পার্থিব বিষয়ের প্রতি অতিশয় বিরাগ। আর আজ আমি ওদের একজনের মধ্যেও এই সব গুণের একটাও দেখতে পাইনা। তাহলে তাদেরকে কি করে গ্রাহ্য করব বা কি করে তাদেরকে দেখে হাসিমুখে সাক্ষাত করব? কেমন করে তারা ইলমের দাবী করে অথচ তারা পার্থিব বিষয়ের উপর একে অপরের ঈর্ষা ও হিংসা করে। আমীর ও নেতৃবর্গের নিকট সমশ্রেণীর ওলামার নিন্দা ও গীবত করে। এসব এই জন্য করে যাতে তাদের অবৈধ অর্থ নিয়ে অপরদের প্রতি ঝুঁকে না যায়। ধিক্ তোমাদের প্রতি হে ওলামাদল! তোমরা যে আম্বিয়ার উত্তরাধিকারী! তাঁরা তো তোমাদেরকে ইল্‌মের ওয়ারেস বানিয়েছেন। যা তোমরা বহন করেছ, কিন্তু তার উপর আমল করতে অনীহা প্রকাশ করেছ। তোমাদের ইল্‌মকে এক পেশা বানিয়ে নিয়েছ। যার দ্বারা তোমরা রুজী-রুটী কামাচ্ছ। তোমরা কি সে ভয় কর না যে, তোমাদের উপরেই প্রথম দোযখের অগ্নি প্রজ্বালিত করা হবে?'

এক অন্ধ ব্যক্তি সুফিয়ান সওরীর সাহচর্যে বসত। রমযান মাস এলে গ্রামাঞ্চলে বের হয়ে যেত। সেখানে লোকেদের ইমামতি করে বস্ত্রাহার উপার্জন করত। একদা সুফিয়ান তাকে বললেন, 'কিয়ামতের দিন আহলে কুরআনকে কিরাআতের বিনিময়ে প্রতিদান দেওয়া হবে আর এই রকম লোকের জন্য বলা হবে, তুমি তোমার প্রতিদান পৃথিবীতেই সত্বর নিয়ে ফেলেছ।' অন্ধ লোকটি বলল, 'আপনি আমার জন্য একথা বলছেন? অথচ আমি আপনার সহচর?' বললেন, 'আমি ভয় করছি যে, কিয়ামতে আমাকে বলা হবে, এতো তোমার সহচর ছিল, কেন ওকে উপদেশ দাওনি?'

শরীক যখন কুফার কাযী (বিচারপতি) নিযুক্ত হলেন তখন সুফিয়ান সওরী তাঁর

সহিত সাক্ষাৎ করে বললেন, 'হে আবু আব্দুল্লাহ! ইসলাম, ফিক্হ ও কল্যাণের (দ্বীনী ইলমের) পর কাযী পেশা (বিচারকার্য) গ্রহণ করলেন এবং কাযী বনে গেলেন?' শরীক তাঁকে বললেন, 'হে আবু আব্দুল্লাহ! লোকদের জন্য কাযীও তো আবশ্যক।' একথা শুনে সুফিয়ান তাঁকে বললেন, 'হে আবু আব্দুল্লাহ! লোকদের জন্য পুলিশও তো আবশ্যক, (তা হলেন না কেন?)'

মালেক বিন দীনার হাসান (রঃ)কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আলেমের শাস্তি কি? তিনি উত্তরে বললেন, 'হৃদয়ের মৃত্যু।' বললেন, 'হৃদয়ের মৃত্যু কি?' হাসান বললেন, 'পরকালের কর্ম দ্বারা ইহকাল অন্বেষণ করা।'

এসব কিছুর জন্যই নবী ﷺ উসমান বিন আবিল আসকে এমন মুআযযিন রাখতে আদেশ করেছিলেন, যে আযানের উপর পারিশ্রমিক না নেয়। *(আবু দাঊদ)*

উলামা ও শাসকগোষ্ঠী

কতক উলামা আছেন যাঁরা ইল্মকে ধনী ও শাসকগোষ্ঠীর নৈকট্যলাভের এবং তাদের নিকট হতে কিছু অর্থ ও স্বার্থ-সিদ্ধিলাভের অস্ত্র স্বরূপ ব্যবহার করেন। যা কোন আলেমের জন্য নেহাতই নিকৃষ্ট ও নীচ আচরণ। এতে ওদের নিকট ইলমের কদর নষ্ট হয় এবং আলেমদের মান-মর্যাদাও ধূলিসাত হয়। তাই এ বিষয়ে বহু সলফে সালেহীন উলামা সমাজকে সচেতন করে বহু উপদেশ প্রদান করে গেছেন।

জা'ফর সাদেক বলেন, 'ফকীহগণ রসূলগণের আমানতদার ও বিশ্বস্ত (প্রতিনিধি); যতক্ষণ তাঁরা শাসকগোষ্ঠীর দরজায় না আসে।'

সুফিয়ান বলেন, 'কোন বান্দা হতে যখন আল্লাহর প্রয়োজন থাকে না তখন তিনি তাকে শাসকগোষ্ঠীর দিকে ঠেলে দেন। যখন কোন ক্বারীকে কোন নেতার দুয়ারে ধরনা দিতে দেখবে তখন জেনো যে, সে চোর! আর তাকে যদি ধনবানদের দরজায় পড়ে থাকতে দেখ তাহলে জেনো যে, সে কপট।'

ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, 'শাকসগোষ্ঠীর দুয়ারে উঁটের আস্তাবলের মত বহু ফিতনা আছে। সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার আত্মা আছে, তোমরা যে পরিমাণ অর্থ তাদের নিকট হতে গ্রহণ করবে তার সমপরিমাণ অথবা তার দ্বিগুণ পরিমাণ দ্বীন ওরা তোমাদের নিকট থেকে বিনষ্ট করে ফেলবে।'

ফুযাইল বিন ইয়ায সুফিয়ান বিন উয়াইনাহকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, 'তোমরা

উলামার দল দেশের প্রদীপ ছিলে, তোমাদের দ্বারা সব আলোকিত হত, কিন্তু এখন তোমরা নিজেরাই আঁধারে পরিণত হয়ে গেছ। তোমরা সেই তারকাপুঞ্জ ছিলে যাদের দ্বারা পথ চেনা যেত, কিন্তু আজ তোমরা নিজেরাই গোলক-ধাঁধা বনে গেছ। তোমাদের কেউ কি আল্লাহকে লজ্জা করে না - যখন সে ঐ আমীরদের নিকট উপস্থিত হয়ে ওদের মাল গ্রহণ করে? অথচ সে জানে যে, ওরা তা কোথা হতে সংগ্রহ করেছে। অতঃপর মিহরাবে এসে নিজের পিঠ এলিয়ে দিয়ে বলে, 'আমাকে অমুক হতে অমুক হাদীস বর্ণনা করেছে----!'

ইবনুল জওযী (রঃ) বলেন, 'ইবলীসের গুপ্তপ্রতারণার মধ্যে এক প্রকার প্রতারণা হচ্ছে, আমীর ও শাসকগোষ্ঠীর সহিত ওলামাদের সংস্রব ও মিলা-মিশা রাখা, তাদের তোষামদ করা এবং সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তাদের অসৎ কাজে বাধা না দেওয়া। কখনো বা তাদেরকে এমন কাজের অনুমতি খুঁজে দেয় যে কাজে ওদের জন্য কোন অনুমতী থাকে না; যাতে ওদের নিকট তারা কিছু পার্থিব সম্পদ ও স্বার্থ উদ্ধার ও উপভোগ করতে পায়। ফলে এর দ্বারা তিন প্রকার লোক তিনভাবে ফাসাদ ও বিপত্তিতে আপতিত হয়;

প্রথমতঃ আমীর বলে, 'যদি আমি সঠিকতার উপর না হতাম তাহলে অমুক আলেম (ফকীহ) আমাকে বাধা দিতেন। আমি সৎ ও সঠিক না হলে উনি আমার মাল খেতেন কেন?'

দ্বিতীয়তঃ জনসাধারণ; তারা বলে, 'আমাদের আমীর, তার সম্পদ ও কর্মে কোন ত্রুটি নেই। যেহেতু অমুক আলেম তো দেখছি অহরহ উনার কাছে যান ও খান।'

তৃতীয়তঃ ঐ আলেম; যিনি এই কর্মের ফলে নিজের দ্বীনকে নষ্ট করেন।

পদ ও খ্যাতি

আলেমদের একটি সম্প্রদায়ের হৃদয়ে পদলোভ এবং প্রসিদ্ধি-লালসা উপচীয়মান থাকে। গুপ্ত আত্মশ্লাঘায় নিজেকেই ঘোষিত পদের যোগ্যতম সভ্য মনে করেন অথচ তিনি সেরূপ নাও হতে পারেন। যশস্কাম মানসে নিজস্ব ক্ষমতার বাইরেও প্রতিভার অভিব্যক্তি ঘটাতে চান, চান বসন্তের সকল প্রস্ফুটিত পুষ্পরাজীর সৌরভ কেবল তাঁরই পুষ্প হতে সারা বিশ্বে বিতরিত হোক। তাই তিনি সর্বদা পদ, নেতৃত্ব, সর্দারী ইত্যাদির সন্ধানে ফেরেন।

এমন শ্রেণীর পদ-লোভী আলেমদের প্রসঙ্গে নবী ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন সৃষ্টির মধ্য হতে সর্বপ্রথম যার উপর অগ্নি প্রজ্বালিত করা হবে সে হল এমন ক্বারী বা আলেম যে কুরআন পড়ে বা ইল্‌ম শিখে এই উদ্দেশ্যে যে, তাকে 'ক্বারী' বা 'আলেম' বলা হোক। যাকে তার মুখ ছেঁচড়ে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে আদেশ দেওয়া হবে। অনুরূপ ঐ প্রকার দানশীল ও যোদ্ধাকে শাস্তি দেওয়া হবে। *(মুসলিম)* যারা নাম ও যশ লাভের উদ্দেশ্যে নিজেদের সামর্থ্য ব্যয় করেছে।

এমন লোকদের স্বাভাবিক আচরণ এও যে, তাঁরা কোন সমবায় সংস্থা বা সংগঠনে সংযুক্ত থাকলে মনে মনে তার পরিচালনাভার কামনা করেন। নির্বাচনের সময় সে কামনায় সফলকাম না হলে ক্ষুব্ধ হয়ে সে সংস্থা বা সংগঠন সত্বর পরিত্যাগ করে বসেন। যার ফলে যে কোনও প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন বিঘ্নিত ও বিপর্যস্ত হতে বাধ্য হয়। কখনো বা বিরোধী পক্ষে গিয়ে মিলিত হলে বিপত্তি আরো বর্ধমান দেখা যায়। তাই তো এমন লালসা বড় নোংরা, বিশেষ করে একজন আলেমের ক্ষেত্রে।

কাসেম বিন উসমান বলেন, 'পদ-লালসা প্রত্যেক ধ্বংসের মূল।'

নবী ﷺ বলেন, "ছাগলের পালে ছাড়া ক্ষুধার্ত দুই নেকড়ের চেয়েও মানুষের সম্পদ-লোভ এবং দ্বীনী মর্যাদা-লালসা অধিক অনিষ্টকারী।" *(তিরমিযী, আহমদ, নাসাঈ)*

সওরী বলেন, 'নেতৃত্বের মত কোন বিষয়ে অধিকতর স্বল্প বিরাগ আমি কারো মাঝে দেখিনি। তুমি মানুষকে দেখবে যে, সে পান-ভোজনে, সম্পদে ও পরিচ্ছদে অনাসক্ত। কিন্তু নেতৃত্বে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এলে সেই মানুষকেই তার উপর প্রতিযোগিতায় প্রযত্নবান হতে এবং বিদ্বেষ প্রকাশ করতে দেখবে।'

ইবরাহীম বিন আদহাম বলেন, 'যে ব্যক্তি খ্যাতি পছন্দ করে সে আল্লাহকে সত্য জানে না।'

মুহাম্মাদ বিন আলা' বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভালোবাসে সে এও ভালোবাসে যে, তাকে যেন লোকে না চেনে।'

ফুযাইল বলেন, 'যে ব্যক্তিই নেতৃত্ব পছন্দ করে সেই ব্যক্তিই অপরের প্রতি হিংসা করে, বিদ্রোহ করে, অপরের ত্রুটি ও ছিদ্র অন্বেষণ করে এবং অন্য কাউকে 'ভালো বলে উল্লেখ করাকে অপছন্দ করে।'

সুফিয়ান বলেন, 'যে ব্যক্তি নেতৃত্ব চায় তার উচিত তার মস্তককে 'শিংলড়াই'-এর জন্য প্রস্তুত রাখা।' অর্থাৎ সমকক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী অন্যান্য মানুষের উপর অত্যাচার, হিংসা ও বিদ্রোহের জন্য তৈরী হয়ে যাওয়া।

বিশ্‌র বলেন, 'যে ব্যক্তি প্রসিদ্ধি চায় তার নিকট তাক্‌ওয়া আসতে পারে না।'
ইবনে তাইমিয়্যাহ (রঃ) বলেন, 'নেতৃত্ব-লোভ প্রত্যেক বিদ্রোহ ও অত্যাচারের মূল।'
মন্দ সঞ্চার ও সঞ্চয়কারী লোভ ছয়টি; বিষয়াক্তি, নেতৃত্ব-লোভ, যশ-লালসা, উদরপূর্তি, অতি নিদ্রা ও আরাম-প্রিয়তা বা বিলাসিতা।
সুফিয়ান সওরী বলেন, '(ইল্‌ম শিক্ষার পর) কোন আলেম যদি সত্বর নেতৃত্ব অথবা পদ গ্রহণ করে তবে তার বহু ইলমের ক্ষতি হয়। কিন্তু যখন শিক্ষা করে আর শিক্ষাই করে তখন সে (প্রকৃত যোগ্যতায়) পৌঁছে যায়। *(হুলয়্যাহ ৭/৮১)*

ইল্‌ম অনুযায়ী আমল

একটি প্রবাদে আছে, 'যার থাকতে বলদ বোহায়না হাল, তার দুঃখ সর্বকাল।' অর্থাৎ যে ব্যক্তি অস্ত্রের ভান্ডার মজুদ রেখেও আত্মরক্ষা করতে অলস বা অসমর্থ সে ব্যক্তির ধ্বংস সত্যই প্রহসনজনক। ইলমের উপকরণ বুকে রেখে মুখে তা বিচ্ছুরিত করে কর্মে রূপায়ন না করা আলেমের জন্য সত্যই ধিক্কারজনক।
কথিত আছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর সহচরবৃন্দের উদ্দেশ্যে বললেন, 'হে বনী ইসরাঈল! অন্ধের জন্য সূর্যালোক উপকারী নয়, কারণ সে দেখতে পায় না। আর আলেমের জন্য ইলমের আতিশয্য উপকারী নয়, যদি সে তার উপর আমল না করে। যে তালেবে ইল্‌ম কেবল লেকচার দেওয়ার জন্য ইল্‌ম অন্বেষণ করে এবং আমল করার জন্য তা শিক্ষা করে না সে কি করে আহলে ইলমের মধ্যে গণ্য হতে পারে?'
হযরত আলী (রাঃ) বলেন, 'হে ইলমের বাহকদল! তোমরা ইল্‌ম অনুসারে আমল কর। যেহেতু আলেম তো সেই ব্যক্তি যে তার ইল্‌ম দ্বারা আমল করে, যার কর্ম তার ইলমের অনুবর্তী হয়। অদূর ভবিষ্যতে কিছু সম্প্রদায় এমন হবে যারা ইল্‌ম বহন করবে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠদেশের নিচে অতিক্রম করবে না। তাদের আমল ইলমের বিপরীত হবে এবং অভ্যন্তর বাহ্যিক রূপের অন্যথা হবে। জামাআত-জামআত হয়ে বসবে, আর পরস্পর আত্মগর্ব প্রকাশ করবে। এমনকি অনেকে তার সহচরের উপর রাগান্বিত হবে যদি সে তাকে ছেড়ে অন্য কারো সাহচর্যে গিয়ে বসে। ঐসব লোকদের আমল ঐসব মজলিস থেকে আল্লাহর প্রতি উত্থিত হবে না।'
শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেন, 'অহংকারী, মানসপূজারী এবং আল্লাহর আয়াতসমূহ হতে বিমুখদল ইল্‌ম অর্জন করে; কিন্তু তারা বুঝে না। যেহেতু

তারা মনমত চলে এবং অহংকারের ফলে যা শিখেছে তার প্রতি আমল ত্যাগ করে; ফলে সমঝ-বুঝ এবং জ্ঞান ছিনিয়ে নিয়ে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়। কারণ, ইল্ম অহংকারীর পরিপন্থী, যেমন পানির স্রোত উঁচু স্থানের প্রতিকূল।

কিন্তু যারা তাঁদের প্রভুকে ভয় করে তারা তাদের ইল্ম অনুযায়ী আমল করে থাকে। ফলে আল্লাহ তাদেরকে ইল্ম ও জ্ঞান দান করে থাকেন। যেহেতু যে ব্যক্তি তার ইল্ম অনুসারে আমল করে আল্লাহ তাকে আরো অজানা ইলমের অধিকারী করেন।'

মালেক বিন দীনার বলেন, 'বান্দা যখন আমল করার উদ্দেশ্যে ইল্ম অনুসন্ধান করে তখন ইল্ম বর্ধনশীল হয়। আর যখন সে আমল ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে শিক্ষা করে তখন ঐ ইল্ম তার দুষ্কর্ম, অহংকার এবং জনসাধারণের প্রতি অবজ্ঞা বৃদ্ধি করে।' বরং এমন অনেক বান্দা তো অহংকারবশে সলফে সালেহীন ও ইমামগণকেও অবজ্ঞা করতে শুরু করে।

হাসান বাসরী (রঃ) বলেন, 'তুমি তোমার কর্ম ও আমল দ্বারা লোককে নসীহত ও ওয়ায কর, আর কেবল তোমার কথা (বক্তৃতা) দ্বারা ওদেরকে ওয়ায করো না।'

তিনি আরো বলেন, 'মানুষ যখন ইল্ম শিখতে শুরু করে তখনই সঙ্গে সঙ্গে তার আচরণে, নয়নে, রসনায়, হস্তে, নামাযে এবং অন্যান্য পার্থিব বিষয়ে তার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। মানুষ যদি কোন ইলমের দুয়ারে পৌঁছে তার উপর আমল করে তবে তা তার জন্য পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থিত সকল বস্তু অপেক্ষা অধিক উত্তম।' *(জামে' ১/৬০)*

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি নিজের কর্ম দ্বারা লোককে উপদেশ দেয় সেই হেদায়াতকারী (পথপ্রদর্শক)রূপে পরিচিত হয়।'

যুন্নূন মিস্রী বলেন, 'তুমি তার সাহচর্যে বস যার কর্ম-গুণ তোমার সহিত কথা বলে এবং তার নিকট বসো না যার জিভ তোমাকে কথা বলে। আর বলা হয় যে, 'ওয়াযকারী (বক্তা)র যাকাতের নিসাব হল, প্রথমে নিজেকেই সেই ওয়াযমত প্রস্তুত করা, তাহলে যার নেসাব নেই সে যাকাত দিবে কেমন করে?'

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, 'তুমি তার মত হয়োনা যে বিনা আমলে পারলৌকিক সুখের আশা করে এবং দীর্ঘ বাসনা হেতু তওবায় বিলম্ব করে। দুনিয়া প্রসঙ্গে বৈরাগীর মত কথা বলে অথচ কর্ম করে দুনিয়াদারের ন্যায়। পার্থিব সম্পদ পেলেও তুষ্ট হয় না, না পেলে বিষয় তৃষ্ণা মিটে না, মানুষকে তা উপদেশ দেয় যা সে নিজে করে না, নেক লোকদের ভালোবাসে কিন্তু তাদের মত আমল করে না। মন্দ লোকদের ঘৃণাবাসে

কিন্তু সে তাদেরই অন্যতম। অধিক পাপের জন্য মরণকে ভয় করলেও যার জন্য

মরণকে ভয় হয় তাতেই সে অবিচল থাকে।'

তিনি আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি নিজেকে জনসাধারণের ইমাম মনে করে তার উচিত, অপরকে শিক্ষা দেওয়ার পূর্বে নিজেকে শিক্ষা দেওয়া এবং মুখ দ্বারা আদব দেওয়ার পূর্বে সদাচরণ ও সচ্চরিত্র দ্বারা আদব দেওয়া।'

জুনাইদ (রঃ) বলেন, 'জেনে রেখো যে, সর্বাপেক্ষা সহজভাবে যা ভক্তদের হৃদয় আকৃষ্ট করে, উদাসীনদের অন্তরকে এবং পশ্চাদ্‌গামীদের মনকে সতর্ক করে তা হল, সেই কর্ম ও আমল যা সকল কথার সত্যায়ন ও বাস্তবায়ন করে। সেটা কি ভালো মনে হবে ভাই যে, একজন আহ্বানকারী কোন কর্মের প্রতি আহ্বান করবে অথচ তার উপর নিজের কোন চিহ্ন বা নিদর্শন থাকবে না? তার নিকট হতে ঐ কর্মে আদর্শ, সৌন্দর্য ও প্রভাব অভিব্যক্ত হবে না! তার বক্তৃতা বাস্তবায়নকল্পে নিজে আমল করবে না এবং ঐ বচন অনুসারে কোন কর্ম করবে না। সে তো মিথ্যুক যে পার্থিব বিষয়ের প্রতি অনাসক্তির বুলি ঝাড়ে অথচ তার কর্মে বিষয়াসক্তের নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়। বর্জন করতে আদেশ করে কিন্তু সে নিজে গ্রহণকারী হয়, শ্রম ও চেষ্টা করতে উদ্বুদ্ধ করে কিন্তু সে নিজে অলস ও নিরুদ্যম হয়। যাদের আচরণ এইরূপ হয় তাদের নীতিকথার শ্রোতা খুবই কম তাদের নিকট থেকে নীতি গ্রহণ করে থাকে। তাদের কর্ম দেখে শ্রোতাদের হৃদয় বীতস্পৃহ হয়। তারা সেই ব্যক্তির জন্য দলীল হয় যে তার মানস-পূজার জন্য 'তাবীল' (দূর ব্যাখ্যা বা তাৎপর্য)কে হেতু করে। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াকে তার আখেরাতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেয় তার পথ সুগমকারীরূপে নিরূপিত হয়। তুমি কি শোননি? আল্লাহ তাআলা শাইখুল আম্বিয়া, তাঁর অন্যতম মহান রসূল এবং তাঁর অন্যতম বড় ওলী শোয়াইব (আঃ)এর সুগুণ বর্ণনা করে বলেন, যা তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, "আমি তার বিপরীত করতে চাইনা যা করতে আমি তোমাদেরকে নির্দেশ করছি।" *(সূরা হূদ ৮৮ আয়াত)* অর্থাৎ আমি যা করতে তোমাদেরকে নিষেধ করছি তা আমি নিজেও করি না।

আল্লাহ আআলা বলেন, "কি আশ্চর্য! তোমরা নিজেদেরকে বিস্মৃত হয়ে মানুষকে সৎকার্যের নির্দেশ দাও, অথচ তোমরা কিতাব অধ্যয়ন কর! তবে কি তোমরা বুঝ না?" *(সূরা বাক্বারাহ ৪৪)*

তিনি অন্যত্রে বলেন, "হে ঈমাদারগণ! তোমরা যা কর না তা বল কেন? তোমরা যা কর না তা বলা আল্লাহর নিকট অতিশয় অসন্তোষজনক।" *(সূরা সাফ্‌ফ ২ আয়াত)*

জনৈক আরবী কবি বলেন;

+

+

+

+

+

অর্থাৎ, হে অপরকে শিক্ষাদাতা শিক্ষক! আপনি নিজের জন্য কেন শিক্ষক হন না? অসুস্থ ও ব্যাধিগ্রস্তের আরোগ্যলাভের জন্য আপনি ঔষধ (ব্যবস্থাপত্র) দান করেন অথচ আপনি নিজেই সেই রোগী! প্রথমে আপনি নিজেকে অসদাচারণ থেকে বাঁচান। অতঃপর (অপরকে বাঁচান তবেই) আপনি প্রকৃত প্রজ্ঞাবান। তখনই আপনার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য এবং আপনার কর্ম অনুসরণযোগ্য হবে, আর শিক্ষাও হবে উপকারী। যে পাপ আপনি নিজে করেন তা হতে অপরকে নিষেধ করবেন না। যদি তা করেন তবে তা হবে আপনার জন্য বড় লজ্জাকর বিষয়।

ইয়াহুদ জাতিকে তওরাত দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তারা তার উপর আমল করেনি। যার প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ তাআলা তাদের উপমা বর্ণনা করে বলেন, "যাদেরকে তওরাত-বিধান দেওয়া হলে তা অনুসরণ (আমল) করেনি তাদের উপমা সেই গর্দভ যে পুস্তক বহন করে। কত নিকৃষ্ট সে সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত যারা আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা জানে!" *(সূরা জুমুআহ ৫ আয়াত)*

ওদের সম্পর্কেই আল্লাহ বলেন, "যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল আল্লাহ তাদের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, 'তোমরা তা (কিতাব) স্পষ্টভাবে মানুষের কাছে প্রকাশ (বর্ণনা) করবে এবং তা গোপন করবে না। এরপরও তারা তা পৃষ্ঠের পিছনে নিক্ষেপ করে এবং স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করে। সুতরাং তারা যা ক্রয় করে তা কত নিকৃষ্ট।" *(সূরা আ-লে ইমরান ১৮৭ আয়াত)*

"পৃষ্ঠের পিছনে নিক্ষেপ করে" এর ব্যাখ্যায় মালেক বিন মিগওয়াল বলেন, 'তারা ঐ কিতাবের উপর আমল ত্যাগ করে।'

আল্লাহ তাআলা জনৈক আমলত্যাগী বড় আলেমের অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, "(হে নবী!) তুমি ওদেরকে ঐ ব্যক্তির বৃত্তান্ত পড়ে শোনাও যাকে আমি নিদর্শনাবলী (কিতাবের জ্ঞান) দান করেছিলাম, অতঃপর সে তার (নৈতিকতার গন্ডী) থেকে বের হয়ে যায় ফলে শয়তান তার পিছনে লাগে এবং সে বিপথগামীদের

অন্তর্ভুক্ত হয়। আর আমি ইচ্ছা করলে এ দ্বারা তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করতাম, কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয় এবং নিজ কামনা-বাসনার অনুসরণ করে। তার অবস্থা কুকুরের মত; যাকে তুমি কষ্ট দিলে সে জিব বার করে হাঁপাতে লাগে এবং কষ্ট না দিলেও সে জিব বার করে হাঁপায়। যে সম্প্রদায় আমার আয়াত (নিদর্শনসমূহকে) প্রত্যাখ্যান করে তাদের অবস্থাও ঐরূপ।" *(সূরা আ'রাফ ১৭৫ আয়াত)*

হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর সহচরবৃন্দকে বলেছিলেন, 'আমি তোমাদেরকে এজন্য শিক্ষা দিচ্ছি না যে তোমরা কেবল (তা শুনে) আশ্চর্যান্বিত হবে। বরং এজন্য শিক্ষা দিচ্ছি যে, তোমরা তার উপর আমল (কর্ম) করবে।

সুতরাং ইল্‌ম প্রচার করাই প্রজ্ঞা নয় বরং তার উপর আমল করাই হল প্রকৃত প্রজ্ঞা।

ইবনে তাইমিয়্যাহ (রঃ) বলেন, 'কুরআন অধ্যয়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা এবং তার উপর আমল করা। সুতরাং এর হিফ্‌যকারী (হাফেয) এর যদি সে সংকল্প না হয় তাহলে সে আহ্‌লে ইল্‌ম ও দ্বীন হতে পারবে না। ইবনে আব্বাস (রাঃ) "যাদেরকে আমি কিতাব দান করেছি তারা তা যথাযথভাবে তেলাঅত (পাঠ) করে" *(সূরা বাক্বারাহ, ১২১ আয়াত)* আল্লাহ তাআলা এই বাণীর ব্যাখ্যায় বলেন, 'অর্থাৎ তারা তা যথার্থরূপে পাঠ করে এবং যথাযথভাবে তার অনুসরণ করে।' *(ইবনে কাসীর ১/২০৫)*

সুতরাং টিয়াপাখীর মত ঠোঁটস্থকারী পাকা পাকা হাফেয এবং মনমুগ্ধকারী কোকিলকণ্ঠে ক্বিরাআতকারী বড় বড় ক্বারী হয়ে বা তৈরী করে সমাজের কি উপকার হতে পারে যদি তার প্রাণ ও আসলত্ব আর কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার মূল উদ্দেশ্য সকলের নিকট গুল থেকে যায়? চিনি বহনকারী যদি না বোঝে যে চিনি মিষ্টি না তেঁতো তবে এমন মুটিয়ার প্রতি শত ধিক্।

অনুষ্ঠানে শ্রোতামন্ডলীর মন-মোহিত করার উদ্দেশ্যেই যদি তেলাঅত হবে তবে তার নির্দেশানুসারে আমল করে বিশ্ববাসীকে মোহিত করার সময় কখন? শুধুমাত্র প্রসূতি প্রসব করা, ব্যাধির জ্বালা এবং জিনের উৎপীড়ন বন্ধ করার উদ্দেশ্যেই কুরআন পাঠ করা এবং তাবীয বানিয়ে গলায়, বাজুতে বা কোমরে বাঁধা হলে পৃথিবীতে অরাজকতা ও দুঃশাসনের উৎপীড়ন বন্ধ করার উদ্দেশ্যে কখন অধ্যয়ন হবে? কুরআনী ললিতসুরের শব্দে মাথা হিলিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করতেই জীবন অতিবাহিত করলে তার নির্দেশকে বাস্তবে রূপ দান করে সমাজের বুনিয়াদ হিলিয়ে

পৃথিবীকে বিস্মিত করার সময় কখন? রূহের মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে মৃতের নামে কুরআনখানী হলে পরিবেশ সংস্কারের উদ্দেশ্যে জীবিতদেরকে আর কখন কুরআনের মূল বক্তব্য শোনানো হবে? ভুয়ো তা'যীমের উদ্দেশ্যে জুজদানে বেঁধে 'বড়চীজ' বলে চুমু খেয়ে বাড়ির উঁচু তাকে তুলে রাখলে তা যথার্থ অধ্যয়ন করে তার অর্থসহ তেলাঅত করতে পেরে কুরআনী জীবন ও পরিবেশ গড়ে আর কখন আমরা পৃথিবীর সর্বোচ্চ স্থানে উন্নত হতে পারব? অথচ আল্লাহ বলেন, "যারা আল্লাহর অবতীর্ণ জীবন-ব্যবস্থা অনুসারে নিজেদের (জীবন, আচরণ ও রাষ্ট্র) পরিচালনা করে না তারা কাফের।" *(সূরা মায়েদাহ ৪৪ আয়াত)*

আল্লাহ বলেন, "তোমার প্রতি যে কিতাব প্রত্যাদেশ করা হয় তা তেলাঅত কর এবং যথার্থভাবে নামায পড়, নিশ্চয় নামায অশ্লীলতা ও অসৎকর্ম থেকে (মানুষকে) বিরত রাখে।" *(সূরা আনকাবুত ৪৫ আয়াত)*

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রঃ) বলেন, 'কিতাব তেলাঅত করা, অর্থাৎ আল্লাহর পূর্ণ আনুগত্য করা।' অনুরূপ অন্যান্য ওলামারাও একই কথা বলেছেন যে, তেলাঅত শুধু ইবাদতের নিয়তেই করা যথেষ্ট নয়। যা যথেষ্ট তা হল তা বুঝা, আমল করা এবং সেই আমলের অন্যতম আমল কুরআন তেলাঅত করা।

মহান আল্লাহ আরো বলেন, "এই কল্যাণময় গ্রন্থ যা আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ উপদেশ গ্রহণ করে।" *(সূরা স্বাদ ২৯ আয়াত)*

হাসান বাসরী বলেন, 'আল্লাহর কসম! কুরআনের অক্ষর ও শব্দ সংরক্ষণ করে এবং ওর দন্ডবিধি বা বিধানসমূহ বিনষ্ট করে (আমল না করে) 'অনুধাবন' হয় না। ওদের কেউ বলবে, আমি গোটা কুরআন পড়েছি; (অথবা মাসে ২/৩ বার খতম করি) কিন্তু ওদের জীবন ও চরিত্রে কুরআনের কোন চিহ্ন ও প্রভাব দেখা যায় না!' *(ফারাইদুল ফাওয়াইদ ১২৭পৃঃ)*

কুরআনী ইল্‌ম যে সহজ নয়, অন্য কথায় কেবল হিফ্‌য ও ক্বিরাআত করাই যে ইলমের শেষ উদ্দেশ্য নয় তা ইবনে উমর (রাঃ) এর কথায় স্পষ্ট হয়ে যায়। তিনি বলেন, 'আমরা এই উম্মতের প্রথম ও পুরোগামী। রসূল ﷺ এর শ্রেষ্ঠ ও সত্তম সাহাবী কুরআনের কেবল একটি সূরা বা তদ্রূপ কিছু যথার্থরূপে প্রতিষ্ঠা করতেন। কুরআন তাঁদের উপর ভারী ছিল। কিন্তু তাঁদেরকে ইল্‌ম ও আমল দান করা হয়েছিল। আর এই উম্মতের শেষভাগের মানুষদের উপর কুরআন এমন হাল্কা হয়ে

যাবে যে, শিশু ও অনারব তা পাঠ করবে। কিন্তু তা কিছুমাত্রাও উপলব্ধি করবে না অথবা তার কিছুও পালন করবে না।'

সুতরাং কুরআন ইল্ম ও আমল। যে কুরআন জানে ও মানে সেই প্রকৃত জ্ঞানী, শিক্ষিত, আলেম ও সভ্য মানুষ। বাকী যে তা জানে ও মানে না সে জ্ঞানী, শিক্ষিত সভ্য বা আলেম কিছুই নয়। সে মূর্খ -চাহে সে যতবড় বৈজ্ঞানিক হোক। নিজেকে প্রগতিশীল বলে দাবী করলেও সে নেহাতই দুর্গতিশীল বেচারা।

মোট কথা, কুরআন খুবই ভারী ও কঠিন তার জন্য যে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাতের উদ্দেশ্যে তা শিক্ষা করে আমল করে। বাকী প্রতিযোগিতা ও ব্যবসার জন্য তা বর্তমান যুগে সহজ। যেমন ইবনে উমর (রাঃ) সূরা বাক্বারাহ শিক্ষা করেছিলেন আট বছরে! আর আজকের শিশু তা এক মাসের চেয়ে কম সময়ে হিফ্য করে ফেলে। সুতরাং উভয় প্রকার শিক্ষার মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট।

দুঃখের বিষয়! এতবড় জ্ঞানভান্ডার থাকতে মুসলিমরা জ্ঞানী বলে পরিচিত নয়। এত বড় শক্তির উৎস থাকতে মুসলিমরা এত বেশী দুর্বল! মুসলিম নিজের ইতিহাস ভুলেছে, পরিচয় ও আত্মমর্যাদা হারিয়েছে, জ্ঞানের পথে চলতে অবজ্ঞা ও অবহেলা করেছে, তাই দ্বীন হারিয়েছে এবং দুনিয়াও। শক্তিসিন্ধুতে ভাসমান থেকেও শক্তিহারা হয়ে মরণের বহু পূর্বেও নির্জীব রয়ে গেছে। কবি সত্যই বলেছেন;

'শক্তি সিন্দু মাঝে রহি হায় শক্তি পেল না যে,
মরিবার বহু পূর্বে জানিও মরিয়া গিয়াছে সে।'

সংযম ও বৈধ পানাহার

উমর বিন সালেহ তুরসূসী ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, 'কোন্ জিনিস দ্বারা হৃদয় নরম হয়?' তিনি উত্তরে বললেন, 'বেটা, হালাল খাওয়া দ্বারা।' অতঃপর তিনি বিশ্র বিন হারেসকেও এই প্রশ্ন করেন। তিনি উত্তরে বলেন, 'জেনে রাখ, আল্লাহর যিকর্ (স্মরণেই) চিত্ত প্রশান্ত হয়।' *(সূরা রা'দ ২৮-আয়াত)*

তুরসূসী বললেন, 'আমি আবু আব্দুল্লাহ (ইমাম আহমদ)কে এবিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, 'হালাল পানাহার।' বিশ্র বললেন, 'উনি আসলটাই উল্লেখ করেছেন।' অতঃপর তুরসূসী আব্দুল অহহাব আল্-অর্রাক্ব এর নিকট উপস্থিত হয়ে ঐ একই প্রশ্ন করলে তিনিও বিশ্র-এর মত উত্তর দিলেন। তিনি বললেন, 'আমি আবু আব্দুল্লাহকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, 'হালাল খাওয়া।' অর্রাক্ব

বললেন, 'উনি মূলের কথাই বলেছেন।'

হ্যাঁ, আজ সেই মূল উপাদানই প্রায় মানুষের নিকট হতে হারিয়ে গেছে। তাই তো হৃদয়ে কোমলতা নেই, প্রশান্তি নেই, নেই অন্তরে-অন্তরে সংযোগ।

সাঈদ বিন মুসাইয়িব বলেন, 'অধিকাধিক নামায রোযা করাই ইবাদত নয়। ইবাদত তো আল্লাহর (দ্বীনের) ব্যাপারে চিন্তা-ফিক্র করা এবং তাঁর হারামকৃত বস্তু হতে সংযত হওয়া।' তাই তো হযরত আয়েশা (রাঃ) সংযমকে দ্বীনের সবচেয়ে বড় অংশ বলতেন।

আব্দুল্লাহ বিন মুবারক বলেন, 'ষাট কোটি দিরহাম দান করার চেয়ে সন্দিগ্ধ একটি দিরহাম গ্রহণ না করাটা আমার নিকট অধিক প্রিয়।'

এক ব্যক্তি হযরত ঈসা (আঃ) এর নিকট অসিয়ত চাইলে তিনি বললেন, 'তোমার রুটি কোথা হতে আসছে তা লক্ষ্য রেখো।'

ফুযাইল বলেন, 'যে ব্যক্তি জানে যে, তার উদরে কি প্রবেশ করছে সে আল্লাহর নিকট সত্যবাদী বলে পরিচিত হবে। সুতরাং তোমার আহার কোথা হতে আসছে তা দেখ, হে মিসকীন!'

আবু আব্দুল্লাহ সাজী বলেন, 'পাঁচটি বিষয় মুমিনের অবশ্যই জানা উচিত; আল্লাহর মা'রেফাত, হকের মা'রেফাত (ন্যায় ও সত্যকে চেনা), আল্লাহর জন্য আমলে ইখলাস (বিশুদ্ধচিত্ততা ও একনিষ্ঠতা রাখা), সুন্নাহ অনুযায়ী সকল আমল (কর্ম) সম্পাদন এবং হালাল রুযী ভক্ষণ।

সুতরাং সে যদি আল্লাহকে চেনে কিন্তু হক না চেনে তাহলে আল্লাহর মা'রেফাত তার কাজ দেবে না। যদি উভয়কেই চেনে কিন্তু আমলে ইখলাস না রাখে তবে মা'রেফাত দ্বারা উপকৃত হবে না। আবার এসব জেনে যদি সুন্নাহ অনুযায়ী কর্ম না করে তবে তাতেও তার কোন লাভ নেই। আর যদি সে তাও করে থাকে কিন্তু তার খাদ্য যদি হালাল না হয় তাহলে ঐ পাঁচের জ্ঞান তার কোন উপকারে আসবে না। পক্ষান্তরে যদি তার খাদ্য হালাল হয় তাহলে তাতে তার হৃদয় স্বচ্ছ হয়; যার দ্বারা ইহ-পরকালের বিষয় তার গোচরীভূত হয়। অন্যথা যদি তার খাদ্য (হারাম ও হালালে) সন্দিগ্ধ হয় তবে ঐ খাদ্যানুসারে সমস্ত বিষয় তার নিকট সন্দেহযুক্ত হয়ে তালগোল খায়। আর খাদ্য যদি হারাম হয় তাহলে দুনিয়া আখেরাতের সমস্ত বিষয় তার নিকট তিমিরাচ্ছন্ন পরিদৃষ্ট হয়। যদিও লোকে তাকে চক্ষুষ্মান বলে তবুও প্রকৃতপক্ষে সে অন্ধ; যে পর্যন্ত সে তওবা না করেছে।'

সুফিয়ান বলেন, 'প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যার খাদ্যে তুমি এই ভয় কর যে, তা তোমার হৃদয়কে বিকৃত করে ফেলতে পারে তার দাওয়াতে উপস্থিত হয়ো না।'

ফুযাইল বলেন, 'আল্লাহর কতক বান্দা আছেন যাঁদের কারণে তিনি অন্যান্য বান্দা ও সকল জনপদকে জীবিত রাখেন। তাঁরা হলেন, আসহাবে সুন্নাহ (যাঁরা সুন্নাহ বা হাদীস অনুযায়ী আমল করেন)। যে ব্যক্তি বুঝতে পারবে যে, তার পেটে হালাল হতে আহার্য প্রবেশ করেছে সে 'হিযবুল্লাহ' (আল্লাহর দল)তে শামিল হয়ে যাবে। আর এগুণ হল আহলে সুন্নাহর।'

হযরত উমর (রাঃ) বলেন, 'রাতের শেষাংশে গোঁ-গোঁ (করে ইবাদত) করাই দ্বীন নয়। দ্বীন তো সংযমে।'

আহার্যে হারাম যাতে অনুপ্রবেশ না করে যায় তার জন্য আবু ওয়াইল নিজের ছেলে ইয়াহয়্যার নিকট থেকেও কিছু গ্রহণ করতেন না। কারণ, ইয়াহয়্যা কাযী (বিচারপতি) ছিলেন। তাই তিনি আশঙ্কা করতেন যে হয়তো বা তাঁর মালে ঘুষ ইত্যাদির সংমিশ্রণ ঘটেছে!

হাসান বলেন, 'শ্রেষ্ঠ ইল্‌ম হল সংযমশীলতা।'

সালেহ বিন মেহরান বলেন, 'যদি কোন আলেমকে দেখ যে সে সংযমী (পরহেযগার) নয় তাহলে তার নিকট ইল্‌ম গ্রহণ করো না।'

আবু হাফ্‌স নিসাপুরী বলেন, 'প্রভুর প্রতি বান্দার উৎকৃষ্ট অসীলাহ হল সর্বাবস্থায় তাঁর প্রতি মুখাপেক্ষিতা, সকল কর্মে সুন্নাহর অনুবর্তী হওয়া এবং হালাল পথে জীবিকা অনুসন্ধান করা।'

সহল বিন আব্দুল্লাহ তস্তরী বলেন, 'আমাদের মূল ছয়টি; আল্লাহর কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ, রসূল ﷺ এর সুন্নাহর অনুসরণ, হালাল ভক্ষণ, কাউকে কষ্ট দান থেকে (নিজেকে ও অপরকে) নিবৃত্তকরণ, পাপ থেকে দূর হওন এবং সকলের অধিকার প্রদান।'

পানাহার হালাল হলেও পরিমিতি আহার করা উচিত। এ বিষয়েও পূর্ববর্তী ওলামাগণ আমল করে গেছেন এবং আমাদের তা করতে উপদেশের মূল্যবান উপহার দিয়ে গেছেন।

ইবনে জামাআহ (রঃ) বলেন, 'মনোযোগ ও উপলব্ধি অর্জন এবং ক্লান্তি ও বিরক্তি দূরীকরণে বড় সহায়ক বিষয়সমূহের অন্যতম হল, স্বল্প পরিমাণ হালাল খাদ্য ভক্ষণ করা।

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন, ' ষোল বছর থেকে আমি খেয়ে পরিতৃপ্ত নই। যেহেতু অধিক খাদ্য ভক্ষণ অধিক পানি পান করতে বাধ্য করে এবং এ সবের আধিক্য অতিনিদ্রা, মেধাহীনতা, স্মৃতিশক্তি-স্বল্পতা, ইন্দ্রিয়-স্তব্ধতা ও দৈহিক আলস্য সৃষ্টি করে। তা ছাড়া পেটপূর্ণ ভোজন শরীয়তের দৃষ্টিতেও অপছন্দনীয়; যা শারীরিক ব্যাধি আনয়ন করে। যেমন বলা হয়, (দেহের শত্রু ভুঁড়ি) 'অধিকাংশ ব্যাধিই পানীয় অথবা খাদ্য থেকেই সৃষ্টি হয়।'

প্রসিদ্ধ ওলামা, আয়েম্মা ও আউলিয়াগণের কেউই অতিভোজনে পরিচিত ছিলেন না। তাঁদের কেউই বেশী খাওয়াকে পছন্দ করতেন না। অতিভোজনকারী প্রশসার্হও নয়। অতিভোজন দ্বারা প্রশংসা করা হয় জ্ঞানহীন চতুস্পদ জন্তুদের; যাদেরকে কঠিন কাজের জন্য প্রস্তুত করা হয়। আর সুস্থ মেধাকে নিকৃষ্ট পরিমাণের আহার গ্রহণ করে বিক্ষিপ্ত ও অচল করা আদৌ উচিত নয়- যার শেষ পরিণতি সকলের নিকট বিদিত।

যদি অতি পান-ভোজনের অন্য কিছু ক্ষতি না হয়ে কেবল এই হত, যা বারবার অধিকাধিক শৌচাগারে যাতায়াত করে হয় তাহলে এতটুকু ক্ষতির হাত হতে বাঁচার জন্য জ্ঞানীর উচিত তা থেকে দূরে থাকা।

যে ব্যক্তি অতি পানভোজনের ও নিদ্রার সাথে ইলমের সাফল্য এবং তাতে অভিষ্টলাভের আশা করে সে এমন বস্তুলাভের আশা করে যা বাস্তবে অসম্ভব। *(তাযকিরাতুস সা-মে' অলমুতাকাল্লিম ৭৪ পৃঃ)*

ইবনে কুদামাহ (রঃ) বলেন, 'উদরপরায়ণতা বৃহৎ সর্বনাশী বস্তুসমূহের অন্যতম। যার কারণে হযরত আদম (আঃ)কে বেহেশ্ত হতে বহিষ্কার করা হয়েছিল। উদর-পরায়ণতায় যৌন-কামোদ্রেক অধিক হয় ও ধন-সম্পদের আকাংখা বৃদ্ধি পায়। এবং আরো বহু সংখ্যক বিপত্তি এসবের অনুবর্তী হয় এই পেটুকতায়।'

উক্‌বা রাসেবী বলেন, 'হাসানের নিকট উপস্থিত হলাম। তখন তিনি দুপুরের খাবার খাচ্ছিলেন। তিনি আমাকে দেখে বললেন, 'এস (খানা খাই)।' আমি বললাম, 'আমি খেয়েছি, আর পারব না খেতে।' তিনি বললেন, 'সুবহা-নাল্লাহ! মুসলিম কি এত খায় যে, পরে আর খেতেই পারে না?'

অবশ্য ভোজনে যা ন্যায় তা হল মধ্যপন্থা; পরিমিত আহার। খাওয়ার ইচ্ছা অবশিষ্ট থাকা সত্ত্বেও অপরিতৃপ্তভাবে হাত তুলে নেওয়া। এই ন্যায়ভক্ষণে শরীর সুস্থ থাকে এবং বহু রোগের প্রতিকার হয়। সুতরাং ক্ষুধা লাগলে খাওয়া উচিত এবং সামান্য

ক্ষুধা ও ইচ্ছা থাকতে খাওয়া বন্ধ করা উচিত।

পক্ষান্তরে প্রতিনিয়ত মাত্রাধিক স্বল্পাহারে শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। যেমন, এক সপ্রদায় স্বল্প খেয়ে শরীরকে শক্তিহীন করে ফরয আদায়ে অক্ষম ও অলস হয়ে থাকে, আর তাদের এ মূর্খতায় মনে করে যে, তা করা ফযীলত; অথচ এমনটা নয়। যিনি ক্ষুধার প্রশংসা করেছেন তিনি ঐ মধ্যপন্থা মিতাহারের প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। *(মুখতাসারু মিনহাজিল কাসেদীন ১৬৩ পৃঃ)*

মোটকথা হল ইন্দ্রিয়দমন ও প্রবৃত্তিকে সংযম করে চলা সকল অবস্থায় আবশ্যক। এই ইন্দ্রিয়দমন আল্লাহর পথের পথিকদের নিদর্শন।

ইবনুল কাইয়্যেম (রঃ) বলেন, 'নবী ﷺ ইন্দ্রিয় সংযমকে একটি মাত্র বাক্যে একত্রীভূত করেছেন। তিনি বলেন, "মানুষের ইসলামের সৌন্দর্যের (শ্রেষ্ঠতার) অন্যতম হল, অনর্থক বিষয়কে পরিত্যাগ করা। *(মুঅত্তা মালেক ২/৪৭০, শরহুসসুন্নাহ ১৪/৩২১, মিশকাত ৩/১৩৬১)* যা বাজে কথা বলা, বাজে দেখা, বাজে শোনা, নিরর্থক গ্রহণ করা, অনর্থক চলা, ফালতু চিন্তা করা এবং ব্যাপকভাবে সর্বপ্রকার গুপ্ত ও প্রকট অপ্রয়োজনীয় কর্মাদি বর্জন করাকে বুঝায়। সুতরাং এই বাক্যটুকুই সংযমের জন্য যথেষ্ট।

ইব্রাহীম বিন আদহম বলেন, 'সংযম-প্রত্যেক সন্ধিগ্ধ বস্তু পরিহার এবং অনর্থক ও অতিরিক্ত সকল বিষয় ত্যাগ করাকে বলে।' *(মাদারিজুস সালেকীন ২/২১)*

এই সংযমশীলতার মূল হল সন্দিগ্ধ বস্তু-বিষয়কে বর্জন করা। অর্থাৎ যে বিষয় বা কর্ম করা বৈধ না অবৈধ এবং যে বস্তু খাওয়া হালাল না হারাম এই নিয়ে মনে সংশয় সৃষ্টি হয় তা ত্যাগ করার নামই সংযম। এরই প্রতি ইঙ্গিত করে এবং সন্ধিগ্ধ বিষয়-বস্তুকে পরিহার করার উপর অনুপ্রাণিত করে আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "হালাল স্পষ্ট, হারামও স্পষ্ট। আর উভয়ের মাঝে রয়েছে কিছু সন্ধিগ্ধ বিষয়-বস্তু। যে ব্যক্তি কোন সন্ধিগ্ধ পাপকে বর্জন করবে সে তো (সন্দেহহীন) স্পষ্ট পাপকে অধিকরূপে বর্জন করবে। আর যে ব্যক্তি সন্ধিগ্ধ কিছু করার দুঃসাহস করবে সে ব্যক্তি অদূরেই স্পষ্ট পাপেও আপতিত হয়ে যাবে। পাপ আল্লাহর সংরক্ষিত চারণভূমি। যে ঐ চারণভূমির ধারে-পাশে চরবে সে অদূরে সম্ভবতঃ তার ভিতরেও চরতে শুরু করে দেবে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

হাফেয ইবনে হাজার (রঃ) বলেন, 'উক্ত হাদীসে আহকামকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। কোন বস্তু বা বিষয়কে করতে স্পষ্ট ভাষায় আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং তা ত্যাগ করার উপর ধমক এসেছে। অথবা কোন বস্তু বা বিষয় ত্যাগ করতে স্পষ্ট

আদেশ এসেছে এবং তা করার উপর ধমক এসেছে। অথবা কোন বস্তু বা বিষয়কে করা বা না করার উপর কোন আদেশ বা ধমক আসেনি। তাহলে প্রথম বিষয়টি হবে স্পষ্ট হালাল ও দ্বিতীয়টি স্পষ্ট হারাম। স্পষ্ট অর্থাৎ, তা হালাল অথবা হারাম এ কথা বর্ণনার প্রয়োজন হবে না। বরং প্রত্যেকেই জানতে ও চিনতে সক্ষম হবে। আর তৃতীয়টি হল সন্দিগ্ধ। যেহেতু তা অস্পষ্ট; তা হালাল না হারাম পরিষ্কার জানা যায় না। আর যার অবস্থা এই হবে তা থেকে দূরে থাকা আবশ্যক। যেহেতু বস্তু যদি প্রকৃতপক্ষে হারাম হয়েই থাকে তাহলে হারামের অনুসরণ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। পক্ষান্তরে তা যদি হালাল হয়ে থাকে তাহলে এই নিয়তে ত্যাগ করার উপর সওয়াবের অধিকারী হওয়া যাবে।' *(ফতহুল বারী ৪/৩৪১)*

রসূল ﷺ বলেন, "ইবাদতের মাহাত্ম্য অপেক্ষা ইলমের মর্যাদা উত্তম। এবং দ্বীনের মূল হল সংযমশীলতা। *(সহীহুল জামে' ৪২১৪নং)*

সুতরাং আলেম ও তালেবে ইলমের উচিত, জীবনের সকল ক্ষেত্র ও বিষয়ে সংযমশীলতা অবলম্বন করা। পানাহার, পোষাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থান এবং প্রয়োজনীয় সকল কিছুতে মিতাচারী হওয়া। যাতে হৃদয় জ্যোতির্ময় হবে এবং ইল্ম, তার নূর ও ফল গ্রহণের জন্য তা উপযুক্ত ও অনুকূল হবে।

তালেবে ইলমের জন্য সংযমশীলতার উচ্চস্থান অধিকার করতে যত্নবান হওয়া উচিত। কোন বিষয়ে কোন রকমের অনুমতি বা 'ফাঁক' অনুসন্ধান করে কোন কোন সন্দিগ্ধ বিষয়ে নিজেকে ফেলা উচিত নয়। বরং স্বচ্ছ হৃদয়ে নবুয়ত ও সাহাবাগণের জ্ঞান-জ্যোতি প্রতিবিম্বিত করাই হল যথোচিত। শ্রেষ্ঠ আদর্শ রসূল ﷺ একদা একটি পড়ে থাকা খেজুর পেয়েছিলেন, খেতে গেয়ে তিনি এই ভয়ে খাননি যে, হয়তো বা তা সদকার খেজুর হতে পারে এবং সদকা খাওয়া তাঁর জন্য বৈধ নয়। *(বুখারী)*

তাই হারাম নয় কিন্তু হারাম হওয়ার আশঙ্কা আছে -এমন কোন বস্তু ভক্ষণ বা গ্রহণ করতে তালেবে ইল্মকে রসূল ﷺ এর অনুকরণ করা উচিত। যেহেতু আলেম ও তালেবে ইল্ম সমাজের আদর্শ ও নমুনা। সমাজ তাদের অনুসরণ করে চলে। সুতরাং তারা যদি সংযমশীলতার সহিত না চলে তবে আর কারা চলবে? *(তাযকিরাতুস সামে' অলমুতাকাল্লিম ৭৫ পৃঃ)*

তদনুরূপ তালেবে ইলমের উচিত অধিকাধিক আল্লাহর যিক্র করা। যেহেতু তাঁর যিক্রে মনে শান্তি আসে; যেমন পূর্বে আলোচিত হয়েছে। কারণ, যিক্র নির্জনতা ও অভাবের সাথী। দুঃখ ও অত্যাচারের মুখে সান্ত্বনা। তালেবে ইল্ম তো ইলমের

মাধ্যমে আল্লাহর মা'রেফাত পায়। তাই তার অভিমুখ হয় আল্লাহরই প্রতি। তাঁরই তুষ্টিতে তার তৃপ্তি হয়, তাঁরই প্রেমে হৃদয় ভরে, তাঁরই যিক্‌রে রসনা আর্দ্র রাখে, তাঁরই মা'রেফাতে প্রফুল্ল ও সদানন্দ থাকে। তাঁর যিক্‌রে এমন জান্নাত পায় তা যদি কোন রাজা জানতে পারে তাহলে তা অধিকার করার জন্য তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে।

ইবনে তাইমিয়্যাহ (রঃ) বলেন, 'পৃথিবীতেই এক জান্নাত আছে। যে ব্যক্তি তাতে প্রবেশ করে না সে পরকালের জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।'

তিনি আরো বলতেন, 'আমাকে আমার শত্রুরা কি করবে? আমার বক্ষে আমার জান্নাত ও তার উদ্যান রয়েছে। আমি কোথাও গেলে তা আমার সাথেই যায়, আমার নিকট থেকে পৃথক হয় না। আমার বন্দীদশা (আল্লাহর সহিত) নিভৃত আলাপ; আমার হত্যা শাহাদত (শহীদী মরণ)। আমার দেশ থেকে আমার বহিষ্কার আমার জন্য পর্যটন। *(আল ওয়া-বিলুস স্বইয়্যেব)*

ইসলামী সংগ্রাম ও বিপ্লবের মুখে অত্যাচারের মোহানায় আল্লাহর যিক্‌রও তালেবে ইলমের বড় হাতিয়ার ও সঙ্গী।

তালেবে ইল্‌মের মযহাব

তালেবে ইলমের মযহাব কুরআন ও সহীহ হাদীসের মযহাব। কোন তকলীদের শৃঙ্খলে পা বেঁধে জ্ঞান অন্বেষণ করলে সঠিক জ্ঞান ধরা দেয় না। কোন বিতর্কিত বিষয়ে মীমাংসা ও সঠিক মত পেতে অন্ধ পক্ষপাতিত্ব বাধা সৃষ্টি করে। মুক্ত ও উদার মনে যে কুরআন ও হাদীস বুঝতে চেষ্টা করে তার জন্য সমস্ত পথ আলোকিত হয়ে যায়। এত পথের মাঝে সঠিক পথ, হক ও রাজপথের সন্ধান মিলে যায়। তাই তালেবে ইলমের পথ হক চেনা। হক দেখে ব্যক্তি চেনা। কোন ব্যক্তি দেখে হক চেনা নয়। এর জন্য তার আদর্শ হচ্ছেন নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ, তাঁর বরণীয়, অনুকরনীয় এবং মাননীয় তিনিই। তাঁর নির্দেশ পেলে আর কার নির্দেশের প্রয়োজন? তাঁর ও তাঁর সাহাবাবর্গের মযহাব মানলে আর কার মযহাব মান্য? বিশিষ্ট তাবেয়ীন, ইমাম আবু হানীফা, মালেক শাফেয়ী, আহমদ বিন হাম্বল (রঃ) দের যে মযহাব ছিল সে মযহাব অপেক্ষা আর কোন্ মযহাব শ্রেষ্ঠ?

ইবনুল কাইয়্যেম বলেন, '---কিন্তু কেবল রসূল ﷺ কে অনুসরণ করা, তাঁকেই

বিচার-ভার অর্পণ করা এবং তা সন্ধান ও উপলব্ধি করার জন্য আত্মার সকল শক্তিকে ব্যয় করা, তাঁর বাণীর উপরে সকল মানুষের রায় ও অভিমতকে পেশ করে বিচার করা, তাঁর পরিপন্থী সকল কথাকে প্রত্যাখ্যান করা, তাঁর কথার অনুসারী সকল কথাকে গ্রহণ ও মান্য করা, আর যে কথা ও অভিমত ওহীর সূর্যালোকে উদ্ভাসিত এবং সত্য ও শুদ্ধ বলে প্রমাণিত সে কথা ও অভিমত ব্যতীত অন্য কারো কথা ও অভিমতের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করা -এমন কাজ মনে পরিকল্পনা করতেও ওদের কাউকে তুমি দেখবে না এটা কারো উদ্দেশ্য ও অভীষ্ট হওয়া তো দূরের কথা। অথচ ঐ কাজের কাজী ছাড়া কেউ মুক্তি পাবে না।

কোথায় রহমত এমন অভাগা বান্দার জন্য যে ইল্ম অন্বেষণ করে, এতে তার সমস্ত শক্তিকে ঢেলে দেয়, তার যাবতীয় সময় ও অবসরকে নিঃশেষ করে, লোকেরা যে ভোগ-বিলাসে আছে তার উপর সে ইল্মকেই প্রাধান্য দেয়, কিন্তু তার ও রসূল ﷺ এর মাঝের পথ অবরুদ্ধ। তার হৃদয় রসূল প্রেরণকারী আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা এবং তাঁর তওহীদ, তাঁর প্রতি প্রত্যাবর্তন, তাঁর উপর আস্থা ও ভরসা, তাঁর প্রেম ও তাঁর সাক্ষাতের খুশী হতে দূরীকৃত ও প্রতিহত।'

মোট কথা হে তালেবে ইল্ম! 'তুমি তোমার শায়খ, ওস্তাদ, মুআল্লিম, মুরাব্বী, মুআদ্দিব (পীর, মুরশীদ, রাহবার, পথের দিশারী ও গুরু) কর একমাত্র রসূলুল্লাহ ﷺ কে। আর তাবলীগ (তাঁর নিকট হতে পৌঁছানো ও বহন) ছাড়া অন্য বিষয়ে সমস্ত মাধ্যম ও বাহনকে তোমার এবং তাঁর মধ্য হতে হটিয়ে দাও - যেমন তুমি তোমার ও আল্লাহর মাঝে তাঁর দাসত্ব ও ইবাদতে সমস্ত মাধ্যম ও অসীলাকে দূর করে থাক। তাঁর নির্দেশ, নিষেধাজ্ঞা এবং তাঁর রিসালত (শরীয়ত) তোমার প্রতি পৌঁছানো ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে কোন মাধ্যম প্রতিষ্ঠা করো না।'

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রঃ) বলেন, 'এই জন্যই ওলামাগণ এবিষয়ে একমত যে, হক জানা গেলে তার বিপরীতে কারো অন্ধানুকরণ বৈধ নয়।'

ইবনুল কাইয়্যেম (রঃ) বলেন, 'একান্তভাবে ত্রুটিহীন নবী ﷺ এর অনুসরণ করা এই যে, তিনি যা আনয়ন করেছেন তার উপরে তুমি কারো কথা বা রায়কে প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার দেবে না; তাতে সে যেই হোক না কেন। বরং প্রথমতঃ তুমি হাদীসের শুদ্ধতা দেখবে। (অনুরূপ অন্য কোন সহীহ হাদীস কর্তৃক তা মনসুখ কিনা তা দেখবে) অতঃপর হাদীস শুদ্ধ হলে তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করবে। এতে যদি রসূলের আদর্শ তোমার নিকট স্পষ্ট হয়ে যায় তবে তা হতে বিমুখ হয়ো না এবং অন্য কারো

আদর্শ গ্রহণ করো না; যদিও প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সকল মানুষ তোমার বিরোধিতা করে। আল্লাহর আশ্রয় যে, সকল উম্মত তাদের নবীর আনীত বিষয়ের অন্যাথাচরণে একমত হবে। (এটা অসম্ভব।) বরং উম্মতের মধ্যে এমন কেউ থাকবেই, যে নবী ﷺ এর ঐ আদর্শের সপক্ষে বলেছে; যদিও তুমি তাকে না জেনেছ। অতএব ঐ সুন্নাহর সপক্ষে মতাবলম্বী সম্পর্কে তোমার অজ্ঞানতাকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে দলীল ও যুক্তি মনে করো না। বরং স্পষ্ট (আল্লাহ ও তাঁর রসূলের) উক্তি যা বলে সেই মত-ই অবলম্বন কর এবং দুর্বলতা প্রকাশ করো না। আর জেনে রেখো যে, নিশ্চিতভাবে এ বিষয়ের কেউ না কেউ মতাবলম্বী আছেই। কিন্তু তোমার নিকট সে খবর পৌঁছেনি। তবে হ্যাঁ, সাথে সাথে ওলামাদের মর্যাদা, তাঁদের সহিত সম্প্রীতি, প্রগাঢ় শ্রদ্ধাপূর্ণ সুধারণা, দ্বীন সংরক্ষণ ও সুবিন্যাসে তাঁদের আমানত ও ইজতিহাদ (সুপ্রচেষ্টা) ইত্যাদির কথা বিস্মৃত হয়ো না; যেহেতু তাঁরা (ভুল করলেও) একটি সওয়াব ও ক্ষমা অথবা (সঠিক করলে) দু'টি সওয়াবের অধিকারী। কিন্তু তা হলেও একথা জরুরী নয় যে, তুমি (কুরআন ও সুন্নাহর) স্পষ্ট উক্তিকে বাতিল ও নাকচ করে দেবে আর তার উপর ওদের কারো কথাকে প্রাধান্য দেবে - এই যুক্তি ও সন্দেহে যে, 'তুমি এ বিষয়ে তার চেয়ে অধিক জানো না।' যদি তাই হয় তাহলে (তোমার পূর্বে) যে ঐ স্পষ্ট উক্তির সপক্ষে মতাবলম্বী সেও তোমার চেয়ে অধিক জানে। তবে তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহলে (যে স্পষ্ট উক্তি বা সহীহ হাদীসের সপক্ষে বলে) তার মত গ্রহণ কর না কেন? সুতরাং যে ব্যক্তি ওলামাদের উক্তিসমূহকে কুরআন ও সুন্নাহর উপর পেশ করে বিচার ও তুলনা করে এবং কুরআন ও হাদীসের উক্তি দ্বারা অন্যান্য উক্তিসমূহকে ওজন করে, অতঃপর যা কিতাব ও সুন্নাহর উক্তির প্রতিকূল হয় তা বর্জন করে ও তার বিরোধিতা করে সে ব্যক্তি ওলামাদের উক্তিসমূহকে নগণ্য করে ফেলছে এবং তাঁদের প্রতি অন্যায় আচরণ করছে তা বলা যায় না। বরং একাজে সে তাঁদেরই অনুসরণ করে; যেহেতু তাঁরা সকলেই এ কথার (কুরআন হাদীসের উক্তি তাঁদের উক্তির প্রতিকূল হলে তাঁদের উক্তি প্রত্যাখ্যান করে কুরআন ও সুন্নাহর উক্তিকে সর্বান্তঃকরণে মেনে নেওয়ার) নির্দেশ দিয়ে গেছেন। অতএব প্রকৃতপক্ষে তাঁদের অনুসারী হল সেই ব্যক্তিই যে তাঁদের সকল নির্দেশকে মান্য করে; সে ব্যক্তি নয়, যে তাঁদের আদেশ অমান্য করে। তাই সেই বিষয়ে তাঁদের বিরোধিতা করা যে বিষয়ে স্পষ্ট উক্তি তাঁদের উক্তির প্রতিকূল, তাঁদের ব্যাপক নীতিতে বিরোধিতা করা অপেক্ষা সহজতর; যে নীতি মান্য করতে তাঁরা আদেশ দিয়ে গেছেন

এবং তার প্রতি সকলকে আহ্বান করে গেছেন। আর তা এই যে, তাঁদের উক্তির উপর (কুরআন ও সুন্নাহর) স্পষ্ট উক্তিকে অগ্রাধিকার দেবে। এখান হতে কোন আলেমের প্রত্যেক উক্তির তকলীদ করার মাঝে এবং তাঁর বুঝ ও উপলব্ধি দ্বারা সাহায্য গ্রহণ করা ও তাঁর ইলমের আলোক দ্বারা জ্ঞান আলোকিত করার মাঝে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায়।

তকলীদ যে করে সে তার মুকাল্লাদ (অনুকৃত) ইমাম বা আলেমের কথাকে নির্বিচারে, চোখ বুজে এবং কিতাব ও সুন্নাহ থেকে তার দলীল ও সমর্থন না খুঁজেই গ্রহণ করে। বরং তাঁর কথাকে রশির মত করে গ্রীবাদেশে 'ক্বিলাদাহ' (বেড়ি বা হার) বানিয়ে পরে নেয়। এর জন্যই একাজকে 'তকলীদ' (অন্ধানুকরণ) বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তাঁর সমঝ ও উপলব্ধি দ্বারা উপকৃত হয় এবং রসূল ﷺ এর মূল আদর্শে পৌঁছনোর উদ্দেশ্যে তাঁর ইলমের আলোকে জ্ঞান আলোকিত করে সে ব্যক্তি তো তাঁদেরকে (ইমাম বা ওলামাগণকে) প্রথম (ও মূল) দিশারীর প্রতি পৌঁছনোর জন্য দিগ্‌দর্শীর পর্যায়ে রাখে। অতঃপর যখনই সে প্রকৃত দিশারীর নিকট পৌঁছে যায় তখনই সে প্রথম দিশারীর পথ প্রদর্শন পেয়ে অন্যান্য দিগ্‌দিশারী থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে যায়। (অর্থাৎ, তাঁদের দিগ্‌দর্শনের প্রয়োজন ও মুখাপেক্ষিতা আর অবশিষ্ট থাকে না।) যেমন যে ব্যক্তি কেবলা জানার জন্য তারকা দ্বারা তা নিরূপণ করে। অতঃপর যখন (সে কেবলার সন্ধান পেয়ে যায় বা) তা প্রত্যক্ষ দর্শন করে তখন আর তারকা দেখা বা তা দিয়ে কেবলা অবধারণ করার কোন অর্থ থাকে না।'

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন, 'সমস্ত মানুষ এ বিষয়ে একমত যে, যার নিকট আল্লাহর রসূলের সুন্নাহ (আদর্শ ও নীতি) অভিব্যক্ত হয় তার জন্য বৈধ নয় যে, সে তা কারো কথায় প্রত্যাখ্যান করে।'

সুতরাং তালেবে ইল্‌ম যখন শরীয়তের সমস্ত আহকামের দলীলাদি জেনে নেবে, হাদীস সহীহ বা যয়ীফ হওয়া সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জন করে নেবে, নাসেখ-মনসূখ (রহিত-অরহিত) বিষয়ে অভিজ্ঞতার্জন করে নেবে, দলীলের নির্দিষ্ট- অনির্দিষ্ট, ব্যাপক-সীমিত প্রভৃতি বিষয়ে পরিচিতি লাভ করবে, আরবী ভাষাজ্ঞান এবং ফিক্‌হের মৌলনীতিসমূহ আয়ত্ত করে নেবে এবং দলীল থেকে শরয়ী নির্দেশ নিরূপণ করতে পারবে তখন সে কোন বিষয়ে কারো অন্ধানুকরণ করবে না। কিন্তু সকল বিষয়ে যদি সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ সম্ভব না হয় তাহলে যে বিষয়ে জ্ঞানলাভ অসম্ভব সে বিষয়ে কোন ইমাম বা আলেমের দলীল অনুধাবন ও পর্যালোচনা করে তাঁর অনুকরণ

বা অনুসরণ করবে।
পক্ষান্তরে মুকাল্লিদ (অনুকরণকারী) যদি মুর্খ হয়, নিজে নিজে শরীয়তের নির্দেশ জানতে যদি অক্ষম হয় তাহলে তার জন্য তকলীদ ফরয। যেমন আল্লাহ বলেন,

﴿ ﴾

অর্থাৎ, তোমরা যদি না জান তবে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা কর। *(সূরা আম্বিয়া ৭ আয়াত)*
কিন্তু তকলীদ তাঁর করবে যিনি ইল্ম ও তাকওয়ায় সব চেয়ে বড় হবেন।

আবার আলেম বা তালেবে ইল্ম হলেও তার জন্য তকলীদ তখন বৈধ যখন তার সামনে অকস্মাৎ কোন সমস্যা এসে যায় এবং সত্বর তার সমাধান প্রয়োজন হয়। আর তার নিকট এমন সময় বা অবকাশ থাকে না যে, যাতে সে দলীল ইত্যাদির অনুসন্ধান করে।

পরন্তু সকল বিষয়েই কোন নির্দিষ্ট মযহাবের তকলীদ করা ওয়াজেব নয়। এ ব্যাপারে ইজমা' (সর্ববাদিসম্মতি) তো হয়নি বরং অনেকে তা বৈধ বললেও সঠিক মতে তা হারাম। যেহেতু প্রত্যেক আদেশ ও নিষেধে কোন অনবীর আনুগত্য মোটেই বৈধ নয়। অবশ্য কোন বিশেষ অবোধ্য সমস্যায় কোন ইমামের সমাধান নেওয়া দূষনীয় নয়।

আবার এমন ব্যক্তি যে কোন মযহাবকে মানে কিন্তু স্বার্থের খাতিরে 'আইনে ফাঁক' খোঁজার উদ্দেশ্যে বিনা কোন ওযরে, অন্য কোন আলেমের ফতোয়া না নিয়ে অথবা নিজে কোন শরয়ী দলীল থেকে তা নিরুপণ না করে ঐ মযহাবের প্রতিকূল কোন কাজ করে তবে সে মানসতার পূজারী ও গোনাহগার। কিন্তু যদি তার নিকট দলীল দ্বারা অথবা অপেক্ষাকৃত কোন কিতাব ও সুন্নাহর শ্রেষ্ঠতর অভিজ্ঞ ও পরহেযগার আলেমের ফতোয়া দ্বারা তার মযহাবের বিপরীত কিছু স্পষ্ট হয়ে যায় তাহলে মযহাবের সমাধান ছেড়ে এই আলেমের সমাধান গ্রহণ করা বৈধ, বরং সেটাই হল ওয়াজেব।

যে ব্যক্তি অপরের ফতোয়া নকল করে তার তকলীদ করে ফতোয়া দেয় তবে প্রয়োজনে তার ফতোয়াও মানা যায়; যদি পূর্বোক্তের মত (অনুকৃত) মুজতাহিদ আলেম বর্তমানে বা নিকটে না থাকেন।

পক্ষান্তরে ফতোয়া দেওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে যা পূরণ না হলে ফতোয়া দেওয়া হারামঃ-

১- মুফতী যেন শরীয়তের সমাধান ও নির্দেশকে দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে অথবা প্রবল ধারণার সাথে জানেন।

২- তিনি যেন প্রশ্ন ও সমস্যার পূর্ণ ধারণা ও বাস্তব কল্পনা করতে পারেন।

৩- ফতোয়া দেবার সময় তাঁর মন ও মস্তিষ্ক যেন সুস্থ, শান্ত ও স্থির থাকে।

আবার ফতোয়া দেওয়া তখনই ওয়াজেব হয় যখন জিজ্ঞাসিত সমস্যা বাস্তবে সংঘটিত হয়, নতুবা কোন কল্পিত বিষয়ে ফতোয়া দেওয়া ওয়াজেব নয়। অবশ্য শিখার জন্য কেউ জানতে চাইলে ইল্‌ম গোপন করা বৈধ নয়।

যদি জানা যায় যে, জিজ্ঞাসকের ফতোয়া জিজ্ঞাসার মাধ্যমে মুফতীকে অপদস্থ করা, তাঁর বিদ্যার দৌড় জানা বা পদস্খলন ঘটানো, অথবা 'আইনে ফাঁক' খোঁজা বা নিজের মনের মত ফতোয়া খোঁজা অথবা এঁর ফতোয়া জেনে অন্য মুফতীর ভিন্নতর ফতোয়া নিয়ে বাচ-বিচার ও সমালোচনা করা এবং 'আলেম যত ফতোয়া তত' বলে আলেম সমাজের বদনাম করা ইত্যাদি নোংরা ও অসৎ উদ্দেশ্য হয় তাহলে তাকে ফতোয়া দেওয়া ওয়াজেব নয়; বরং অনেক ক্ষেত্রে জায়েয নয়।

যেমন তখনও ফতোয়া দেওয়া উচিত নয় যখন জানা যায় যে, ফতোয়া দিলে এই ফতোয়ার কারণে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ বিপত্তি ও ক্ষতির সৃষ্টি হবে। তখন দুই বিপত্তির ক্ষুদ্রটিকে স্বীকার করে বৃহৎটিকে সংঘটিত হতে না দেওয়ার জন্য ফতোয়া দানে বিরত হওয়া ওয়াজেব।

তদনুরূপ জিজ্ঞাসকের উচিত ও অবশ্যকর্তব্য এই যে, তার ঐ ফতোয়া জিজ্ঞাসায় যেন সেই অনুযায়ী আমল করা উদ্দেশ্য হয়। আর এর পশ্চাতে 'ফাঁক খোঁজা' বা মুফতীর বিদ্যা মাপা ইত্যাদি অসৎ উদ্দেশ্য যেন না হয়।

দ্বিতীয়তঃ এমন মুফতীর নিকট ফতোয়া জিজ্ঞাসা করবে যিনি ফতোয়া দানের উপযুক্ত, এবং তার প্রবল ধারণামতে তিনিই যোগ্যতম ও অভিজ্ঞতম আলেম। যিনি তাকওয়া ও আমলে অন্যান্য থেকে শ্রেষ্ঠ। নচেৎ 'এর-ওর' নিকট থেকে ফতোয়া নিয়ে আমল করা যথেষ্ট নয়। যেহেতু না জানলে আল্লাহ আহলে ইল্‌মকে জিজ্ঞাসা করতে বলেছেন। আর আহ্‌লে ইল্‌ম কে তা এ পুস্তিকার বহু স্থানে আলোচিত হয়েছে।

আবার ফতোয়া দানে খেয়ালখুশীর বশবর্তিতা, কিতাব ও সুন্নাহর মত ব্যতীত কোন ভিন্নমতের পক্ষপাতিত্ব এবং চূড়ান্ত সমাধান ছেড়ে নিজের অথবা ওস্তাদের অথবা জিজ্ঞাসকের মনমত ফতোয়া দেওয়া বৈধ নয়। যেমন দু'টি বিতর্কিত বিষয়ের একটি চূড়ান্ত জেনেও এরূপ বলা বৈধ নয় যে, 'এটাও ঠিক ওটাও ঠিক।' বরং যেটাই সঠিক ও শুদ্ধ প্রমাণসিদ্ধ সেটাই ব্যক্ত করা উচিত ও জরুরী। আবার অল্প বিদ্যায় ফতোয়া দেওয়া উচিত নয়। সুহনূন বিন সাঈদ বলেন, 'যার ইল্ম কম সেই বেশী ফতোয়া দেওয়ার জন্য শীঘ্রতা করে। তার নিকট কিছু ইল্ম হলে (দু'চারটি বিরল কিতাব পত্র পাঠ করে) ভাবে প্রকৃত ইল্ম ও হক তারই নিকট। আর এর ফলে প্রকৃত মুফতী ও আলেমদের বিরোধিতা শুরু করে। যেহেতু 'অল্প জলে পুঁটি মাছ ফরফর্ করে।' *(জামে' ২/১৬৫)*

আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অনুগত তালেবে ইলমের নির্দিষ্ট পরিচয়ের কোন রঙ নেই। ইবনুল কাইয়্যেম (রঃ) অনুগত বান্দার লক্ষণ উল্লেখ করে বলেন, 'সে কোন নির্দিষ্ট (দলীয়) নামের বাঁধনে নিজেকে বাঁধে না, কোন পরিকল্পনা বা প্রতীকের ফাঁদে সে ফাঁসে না, কোন নির্দিষ্ট নাম বা পরিচ্ছদে সে সুপরিচিত হয় না এবং মনগড়া কল্পিত পদ্ধতি ও নীতিও সে মানে না। বরং যখন সে জিজ্ঞাসিত হয় যে, 'তোমার গুরু কে?' তখন বলে, 'রসূল।' 'তোমার নীতি কি?' বলে, 'অনুসরণ।' 'তোমার পরিচ্ছদ কি?' বলে, 'সংযম (তাকওয়া)।' 'তোমার মযহাব কি?' বলে, '(কুরআন ও) সুন্নাহর প্রতিষ্ঠা।' 'তোমার উদ্দেশ্য কি?' বলে, 'আল্লাহর সন্তুষ্টি।' 'তোমরা খানকাহ কোথায়?' বলে, 'মসজিদ।' 'তোমার বংশ কি?' বলে, 'ইসলাম----।'

শায়খ বকর আবু যায়দ তালেবে ইল্মকে সম্বোধন করে অসিয়ত করে বলেন, 'ইসলাম (আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ) ও সালাম (শান্তি) ছাড়া মুসলিমদের আর কোন নিদর্শন নেই। অতএব হে তালেব ইল্ম! আল্লাহ তোমার মধ্যে ও তোমার ইলমে বর্কত দান করুন। ইল্ম সন্ধান কর। আমল অন্বেষণ কর এবং আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান কর সলফের পথ ও পদ্ধতিমতে। কোন জামাআতে (দলে বা সংগঠনে) প্রবেশ করো না। তা করলে প্রশস্ততা থেকে তুমি সঙ্কীর্ণ খাঁচায় বন্ধ হয়ে যাবে। ইসলামের পুরোটাই তোমার জন্য চলার পথ ও জীবন-পদ্ধতি এবং সমগ্র মুসলিমরাই এক জামাআত। আর আল্লাহর হাত জামাআতের উপর। যেহেতু ইসলামে কোন দলাদলি নেই। আমি তোমার জন্য আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি যে, তুমি যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভিন্ন বাতিল ফির্কা, জামাআত, মযহাব এবং অতিরঞ্জনকারী

দলের মাঝে দৌড়ে না যাও, তার উপর তুমি তোমার সম্প্রীতি ও বিদ্বেষের বুনিয়াদ না রাখ। সুতরাং তুমি রাজপথের তালেবে ইল্‌ম হও, সুন্নাহর অনুসারী হও, সলফের (সাহাবাবৃন্দের) পদাঙ্কানুসরণ কর, সজ্ঞানে আল্লাহর পথে মানুষকে আহ্বান কর। মানীদের মান ও অগ্রগামিতা স্বীকার কর। জেনে রেখ, অভিনব গঠন ও গতিভিত্তিক দলাদলি যা সলফের যুগে পরিচিত ছিল না তা ইলমের পথে প্রধান প্রধান প্রতিবন্ধকসমূহের অন্যতম এবং জামাআত ছিন্নবিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণ। যেহেতু এই দলাদলিই ইসলামী সংহতির রজ্জুকে কত ক্ষীণ করে ফেলেছে এবং এরই কারণে মুসলিম সমাজে কত বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে! অতএব আল্লাহ তোমার প্রতি সদয় হন তুমি বিভিন্ন দল ও ফির্কা থেকে সাবধান হও; যার চক্রান্ত ও দুরভিসন্ধি সুস্পষ্ট। এ সমস্ত দল তো গৃহছাদে সংযুক্ত পানি নিকাশের পাইপের মত; যা ঘোলা পানি সমূহকে (নিজের মধ্যে একত্রে) জমা করে এবং নিরর্থক বর্জন করে।

তবে হ্যাঁ, তোমার প্রতিপালক যার প্রতি করুণা করেছেন ফলে সে নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবাবৃন্দের পথে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।' *(তাসনীফুন্নাস)*

পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা ও শিষ্টতা

তালেবে ইলমের উপর ওয়াজেব বিদআত ও কুসংস্কার হতে নিজেকে মুক্ত রাখা এবং সর্বাবস্থায় রসূল ﷺ এর আদর্শ-অলঙ্কারে নিজেকে অলঙ্কৃত করা। অযু, গোসল তথা দেহ, লেবাস এবং বাসস্থানের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার প্রতি যথাসাধ্য খেয়াল ও চেষ্টা রাখা।

আব্দুল মালেক মায়মূনী বলেন, 'আমি জানি না যে, আমি আহমদ বিন হাম্বল (রঃ) অপেক্ষা অধিকতর পোশাকে পরিচ্ছন্ন, গোঁপ, চুল ও অতিরিক্ত লোম প্রভৃতি পরিষ্কার রাখতে নিজের প্রতি যত্নবান এবং পরিধানে পবিত্র ও শুভ্র আর অন্য কাউকে দেখেছি।'

যেহেতু ইমাম আহমদ (রঃ) সুন্নাহর সাথে চলতেন এবং সুন্নাহর সাথে থামতেন। তিনি বলেন, 'আমি এমন কোন হাদীস লিখিনি যার উপর আমি আমল করিনি। এমন কি আমার নিকট এক হাদীস এল যে, "নবী ﷺ (দূষিত রক্ত বের করার জন্য) শৃঙ্গ লাগালেন এবং (শৃঙ্গ-ওয়ালা) আবূ তাইবাকে এক দীনার দিলেন।" তখন আমিও শৃঙ্গ লাগিয়ে শৃঙ্গ-ওয়ালাকে এক দীনার দিলাম।'

পরিছন্নতার এ উদ্দেশ্য নয় যে, তাতে অতিরঞ্জন, বিলাসিতা ও গর্ব করা হবে। বরং উদ্দেশ্য মধ্যপন্থা। রসূল ﷺ বলেন, "পরিচ্ছদে বিনতি ঈমানের এক অংশ।" *(সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ ৩৪১ নং)*

আবূ আব্দুল্লাহ আলবূশাঞ্জী বলেন, 'উক্ত হাদীসের অর্থ, পরিধান ও শয্যায় বিলাসহীন (মামুলী ধরনের) বস্ত্র ব্যবহার ঈমানের মধ্যে গণ্য। আর তা হচ্ছে লেবাস ও বিছানায় বিনয় প্রকাশ করা; অর্থাৎ তাতে অধিক মূল্যবান এমন বস্ত্র ব্যবহার না করা যা সংসার-অনুরাগী মানুষদের লেবাস।' *(আল জামে' লিআখলাকির রাবী অসসামে' ১/ ১৫৪)*

খতীব (রঃ) বলেন, 'ক্রীড়া-কৌতুক, রঙ-তামাশা, জনসমক্ষে নির্বুদ্ধিতা, অট্টহাসি, হা-হা ধ্বনি, অদ্ভুত ও আনখা কথা এবং অধিকরূপে ও সর্বদা মজাক-ঠাট্টা ও উপহাস দ্বারা প্রগল্‌ভতা প্রকাশ করে ধৃষ্ট হওয়া থেকে দূরে থাকা ওয়াজেব। স্বল্প ও বিরল হাসিই হাসা বৈধ যা আদবের সীমা এবং ইলমের আদর্শ-বহির্ভূত না হয়। পক্ষান্তরে নিরবচ্ছিন্ন, অশ্লীল, নির্বুদ্ধিতাব্যঞ্জক, ক্রোধ সঞ্চারক এবং বিবাদ-বিপত্তি আনয়নকারী হাসি-তামাশা নিন্দিত। অতিশয় হাসি-মজাক মানুষের মর্যাদা হ্রাস করে এবং চক্ষুর্লজ্জা ও শালীনতা দূর করে দেয়।'

ইমাম মালেক (রঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ইল্‌ম অন্বেষণ করে তার মধ্যে মর্যাদাশালী ব্যক্তিত্ব, গাম্ভির্য এবং আল্লাহভীতি থাকা আবশ্যক। আর সে যেন বিগত ওলামাদের আদর্শের অনুসারী হয়।'

সাঈদ বিন আমের বলেন, 'আমরা হিশাম দাস্তাওয়ায়ীর নিকট ছিলাম। এমন সময় আমাদের মধ্যে একজন (কোন কথায়) হেসে উঠল। হিশাম তাকে বললেন, 'হাসছ, অথচ তুমি হাদীস অনুসন্ধান করছ?!'

আব্দুর রহমান বিন মাহদী বলেন, 'হিশাম দাস্তাওয়ায়ীর নিকট এক ব্যক্তি হাসলে তিনি তাকে বললেন, 'হে যুবক! তুমি ইল্‌ম অন্বেষণ করছ আর হাসছ?!' লোকটি বলল, 'আল্লাহই কি হাসান না ও কাঁদান না?' তিনি বললেন, 'তাহলে তুমি কাঁদ।' *(আলজামে' লিআখলাকির রাবী ১/ ১৫৬)*

মোটকথা, সুন্নাহর অনুসরণ, সুন্দর বেশভূষা এবং দেহ ও পরিধেয় পোশাক-পরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতা দ্বারা বাহ্যিক পবিত্রতা অর্জন সকল মুসলিমের জন্য বাঞ্ছিত। কিন্তু তা তালেবে ইলমের নিকট হতে অধিক তাকীদরূপে প্রার্থিত। যেহেতু ইল্‌ম তাকে শালীনতা ও মর্যাদাবোধের প্রতি দিগ্‌দর্শন করে।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "সে ব্যক্তি বেহেশ্ত্ প্রবেশ করবে না যে ব্যক্তির হৃদয়ে অণুপরিমাণও অহংকার থাকবে।" এক ব্যক্তি বলল, '(হে আল্লাহর রসূল!) মানুষ তো এটা পছন্দ করে যে, তার পরিধেয় বস্ত্র এবং জুতা সুন্দর হোক।' তিনি বললেন, "আল্লাহ তো সুন্দর, তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। অহংকার তো ন্যায়কে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে অবজ্ঞা ও ঘৃণা করার নাম।" *(মুসলিম)*

রসূলুল্লাহ ﷺ সুগন্ধি ভালোবাসতেন এবং যত্ন করে তা নির্দিষ্ট পাত্রে জমা রাখতেন। *(মুখতাসারু শামায়িলিত্ তিরমিযী, আলবানী ১১৭ পৃঃ)* দুর্গন্ধযুক্ত বস্তুকে অতিশয় ঘৃণা করতেন। কাঁচা পিঁয়াজ, রসূন ও কুর্রাসের উগ্র গন্ধকে নিতান্ত মন্দবাসতেন। যার জন্য যারা এসব ভক্ষণ করে তাদের মসজিদ প্রবেশ করাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। *(মুসলিম)*

তাই তালেবে ইল্‌মকেও এমন দুর্গন্ধময় বস্তু ব্যবহার না করা উচিত, যাতে অপর লোকে কষ্ট পায় এবং কাঁচা পিঁয়াজ, রসূন অপেক্ষাও নিকৃষ্টতর দুর্গন্ধযুক্ত ও ঘৃণিত বস্তু যেমন, বিড়ি, সিগারেট, তামাক, খইনি, গুল, গোরাকু, জর্দা প্রভৃতি থেকেও বহু সুদূরে থাকা ওয়াজেব। যেহেতু এগুলি তো এমনিতেই হারাম, তাহলে তালেবে ইলমের ক্ষেত্রে কি তা সহজে অনুমেয়।

যেমন, নবী ﷺ ৪০ দিনের পূর্বে-পূর্বেই গোঁফ ছাঁটতে, নখ কাটতে, বগল ও নাভির নিম্নাংশের লোম ফেলতে নির্দেশ দিয়েছেন, দাঁতন করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন ইত্যাদি। সুতরাং তালেবে ইলমকে সেই সব সুন্নাহর অনুসরণ করে বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা আবশ্যক। যেহেতু তারাই নবুয়তের ইল্‌ম-সন্ধানী। অতএব তাদেরকেই নবী ﷺ এর সুন্নাহর অধিক অনুবর্তী হওয়া উচিত।

পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা মানুষকে সজীব, সতেজ ও তরোতাজা করে এবং হৃদয়-মনে এনে দেয় আনন্দ, উল্লাস ও স্ফূর্তির আমেজ। সুতরাং নিয়মিতভাবে নিজের বাড়িতে পড়ার কক্ষ, খাবার রুম, শোবার জায়গা এবং তদনুরূপ স্কুল বা মাদ্রাসাতেও নিজের সকল প্রকার অবস্থানক্ষেত্র, নিজের পরিধেয় কাপড়-চোপড়, দেহ-মন প্রভৃতি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা তালেবের কর্তব্য। যেমন নিজের বই-পত্র ভালোভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখা, নিয়মতান্ত্রিকভাবে ওযু-গোসল করা উচিত। ভোরের তাজা হাওয়া খাওয়ার সাথে একটু শরীরচর্চা বা ব্যায়াম করার ফলে সারা দিন শরীর ও মনটা স্বচ্ছ, নির্মল ও জড়তাহীন থাকে। ফলে পাঠেও মন বসে ভালো। এইভাবে পরিচ্ছন্নতার সাথে প্রত্যহ একটা নিয়ম-শৃঙ্খলা ও দৈনন্দিন রুটিন অনুযায়ী চললে ইলম খুব সহজে রপ্ত হয়।

অনুরূপভাবে তালেবে ইলমের জন্য আবশ্যক, সর্বপ্রকার নোংরা আচরণ, অশ্লীল ব্যবহার ও গুণ হতে স্বীয় আত্মাকে শুদ্ধ ও পবিত্র রাখা। যেহেতু ইলম অন্তরের ইবাদত, গুপ্ত নামায এবং বাতেনী নৈকট্য। বাহ্যিক অঙ্গসমূহের কৃত নামায যেরূপ অপবিত্রতা ও নোংরামী থেকে বাহ্যিক দেহকে পবিত্র না করে গ্রহণযোগ্য হয় না, ঠিক তদ্রূপই গুপ্ত ইবাদত এবং ইলম দ্বারা হৃদয়ের আবাদ অসদাচরণ ও দুষ্ট পাপগুণ হতে অভ্যন্তরকে পবিত্র ও পরিষ্কার না করে শুদ্ধ হয় না।

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿ ﴾ অর্থাৎ, মুশরিকরা তো অপবিত্র। *(সূরা তওবা ২৮ আয়াত)* এই বাণী এ বাস্তবের প্রতিই ইঙ্গিত করে যে, পবিত্রতা ও অপবিত্রতা কেবল বাহ্যিক ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং তা আভ্যন্তরীণ বিষয়ের সহিতও সম্পৃক্ত। তাই তো মুশরিকের পরিধেয় বস্ত্র পবিত্র ও পরিষ্কার হতে পারে এবং তার দেহ ধৌত হতে পারে; কিন্তু মূলতঃ সে অপবিত্র। তার অভ্যন্তর নোংরামীতে পরিপূর্ণ। আর অপবিত্রতা তাকে বলা হয় যা থেকে হৃদয় দূরে থাকতে চায় এবং যা হতে বাঁচা হয়। বাহ্যিক অপবিত্রতার চেয়ে আভ্যন্তরিক অপবিত্রতা অধিক মারাত্মক যা ভবিষ্যতে ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী করে। তাই এই অপবিত্রতা থেকে সাবধানতা অধিক যত্ন পাবার যোগ্য।

ইবনে উমর হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একদা জিবরীল (আঃ) রসূল ﷺ এর নিকট আসার ওয়াদা দিয়ে আসতে বিলম্ব করলেন। শেষ পর্যন্ত রসূল ﷺ এর পক্ষে (এ প্রতীক্ষা) কঠিন হয়ে উঠল। তিনি (গৃহ হতে) বের হয়ে গেলেন। (বাইরে) জিবরীল (আঃ) তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করলেন। তিনি (বিলম্ব হওয়ার) অভিযোগ জানালে জিবরীল (আঃ) বললেন, 'আমরা সে ঘরে প্রবেশ করি না যে ঘরে কুকুর বা মূর্তি (ছবি) থাকে।' *(বুখারী)*

আবু হামেদ গাযালী (রাঃ) বলেন, 'হৃদয় এক গৃহ; যা ফিরিশ্তা ও তাঁদের প্রভাব অবতরণের স্থান এবং তাঁদের বাসস্থান। আর নিকৃষ্ট গুণ যেমন, ক্রোধ ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, হিংসা, অহংকার, গর্ব ইত্যাদি ঘেউ-ঘেউকারী কুকুরদল। তাহলে তাতে ফিরিশ্তা কেমন করে প্রবেশ করবে যদি তা কুকুরদলে পরিপূর্ণ হয়?' *(ইহয়াউ উলুমিদ্ দীন ১/৪৩)*

ইবনে জামাআহ বলেন, 'তালেবে ইলমের উচিত, তার হৃদয়কে প্রত্যেক প্রতারণা, নোংরামী, বিদ্বেষ, হিংসা, কুবিশ্বাস এবং কুচরিত্রতা থেকে পবিত্র করা; যাতে করে তা ইলম গ্রহণ ও হিফয করা, সূক্ষ্ম মর্মার্থ এবং নিগূঢ় তত্ত্বের রহস্য উদ্ঘাটন করায়

জন্য যথাযোগ্য হয়ে উঠে। যেহেতু ইল্‌ম হল -যেমন কিছু ওলামা বলেন,- 'গুপ্ত নামায, আন্তরিক ইবাদত এবং বাতেনী নৈকট্য।'

ইল্‌মের জন্য অন্তরকে যদি বিশুদ্ধ করা যায় তবে ইল্‌ম বৃদ্ধি পায় এবং তার বর্কত প্রকাশিত হয়। যেমন কোন জমিকে যদি চাষের জন্য ঘাস, আগাছা ইত্যাদি থেকে পরিষ্কার করে উপযুক্ত করা হয় তবে তার ফল-ফসল বৃদ্ধিলাভ করে থাকে। রসূল ﷺ বলেন, "জেনে রেখো, দেহের মধ্যে একটি পিন্ড আছে; যা সংশোধিত হলে সারা দেহ সংশোধিত হয় এবং তা বিকারগ্রস্ত হলে সারা দেহ বিকারগ্রস্ত হয়ে যায়। জেনে রেখো, তা হল হৃৎপিন্ড (বা হৃদয়)। *(বুখারী ও মুসলিম)*

সাহ্‌ল বলেন, 'সেই হৃদয়ে (ইলমী) নূর প্রবেশ করা অসম্ভব যে হৃদয়ে এমন বস্তু অবশিষ্ট থাকে যা আল্লাহ আয্‌যা অজাল্ল অপছন্দ করেন।' *(তাযকিরাতুস সা-মে' ৬৭ পৃঃ)*

সুতরাং তালেবে ইল্‌মের হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করা একান্ত আবশ্যক। তওবা ও অনুশোচনার সাথে আল্লাহর অভিমুখী হয়ে পাপ ও অন্যথাচরণ হতে প্রত্যাবর্তন করা নিতান্ত জরুরী। যেহেতু পাপ ও অবাধ্যতায় এমন কুপ্রভাব আছে যাতে ইল্‌ম থেকে বঞ্চিত হতে হয় অথবা তার বর্কত উঠে যায়।

ইবনুল কাইয়েম (রঃ) বলেন, 'পাপাচরণের নিকৃষ্ট ও নিন্দিত প্রভাব আছে, যা অন্তর ও দেহের পক্ষে ইহ-পরকালে এতই অপকারী যে, তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। তন্মধ্যে ইল্‌ম থেকে বঞ্চিত হওয়া অন্যতম। যেহেতু ইল্‌ম একপ্রকার নূর (জ্যোতি) যা আল্লাহ তাআলা মানুষের হৃদয়ে প্রক্ষেপ করে থাকেন। আর পাপাচরণ ঐ জ্যোতিকে নির্বাপিত করে ফেলে।'

একদা ইমাম শাফেয়ী ইমাম মালেকের সম্মুখে পড়তে বসলে ইমাম মালেক তাঁর সজাগ বুদ্ধিমত্তা, মেধার ঔজ্জ্বল্য এবং উপলব্ধির পরিপূর্ণতা দেখে বিস্মিত হয়ে বললেন, 'আমি দেখছি যে, আল্লাহ তোমার হৃদয়ে নূর প্রক্ষিপ্ত করেছেন। অতএব তা পাপাচরণের অন্ধকার দ্বারা নিভিয়ে দিও না।'

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন,

+

+

'আমি আমার ওস্তাদ অকী'র নিকট আমার মুখস্থশক্তি দুর্বল হওয়ার অভিযোগ করলাম। তিনি আমাকে পাপাচরণ পরিহার করতে নির্দেশ দিলেন এবং বললেন,

'জেনে রেখো, ইল্‌ম আল্লাহর তরফ হতে আসা অনুগ্রহ বা) নূর। আর আল্লাহর (অনুগ্রহ বা) নূর কোন পাপিষ্ঠকে দেওয়া হয় না।' *(আল জওয়াবুল কাফী ৫৪ পৃঃ)*

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ ﴾

অর্থাৎ, আল্লাহ অবশ্যই কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না; যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে। *(কুঃ ১৩/১১)*

তিনি আরো বলেন,

﴿ ﴾

অর্থাৎ, কক্ষনো না। ওদের কৃতকর্মের ফলেই ওদের হৃদয়ে জং ধরে গেছে। *(কুঃ ৮৩/১৪)*

ইবনুল জওযী (রঃ) বলেন, আব্দুল্লাহ বিন জালা' হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি এক খ্রীষ্টান সুবদন কিশোরের প্রতি তাকিয়ে ছিলাম। এমন সময় আবূ আব্দুল্লাহ বালখী আমার নিকট বেয়ে অতিক্রম করছিলেন। তিনি আমার উদ্দেশ্যে বললেন, 'কেন দাঁড়িয়ে আছ এখানে?' আমি বললাম, 'চাচাজী! আপনি কি ঐ রূপ দেখছেন না? কিভাবে ওকে অগ্নিদগ্ধ করা হবে?' তা শুনে তিনি তাঁর হাত আমার কাঁধে মেরে বললেন, 'এর প্রতিফল তুমি পাবেই, যদিও কিছু বিলম্বে।' তিনি বলেন, 'আমি তার প্রতিফল ৪০ বছর পর পেলাম; আমাকে কুরআন ভুলিয়ে দেওয়া হল।'

আবূ আদ্‌ইয়ান বলেন, আমি আমার ওস্তায আবুবকর দাক্কাকের সহিত ছিলাম। ইতিমধ্যে এক কিশোর পার হয়ে যাচ্ছিল। আমি তার দিকে তাকিয়ে ফেললাম। আমার ওস্তায আমাকে ওর প্রতি তাকিয়ে থাকতে দেখলে তিনি আমাকে বললেন, 'বেটা! এর প্রতিফল তুমি পাবে -যদিও কিছু পরে।' অতঃপর আমি ২০ বছর ধরে লক্ষ্য করেও ঐ প্রতিফল বুঝতে পারলাম না। একদা রাত্রিকালে ঐ কথা চিন্তা করে ঘুমিয়েছি। সকালে জাগ্রত হয়ে দেখি আমাকে কুরআন বিস্মৃত করা হয়েছে। *(তালবীসে ইবলীস ৩১০ পৃঃ)*

এ তো সুদর্শন কিশোর দেখার প্রতিফল। তাহলে সুবদনা ও সুদর্শনা কিশোরী ও যুবতী দেখলে এবং তাদের সহিত অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করলে তার প্রতিফল কি?

মনের মণিকোঠা যদি বাজে চিন্তা, যৌন ও অশ্লীল কল্পনা এবং কোন অবৈধ নারী-প্রেমের মৃদু পরশ থেকে মুক্ত ও পবিত্র না হয় তাহলে সফলতার আশা নেই। প্রেমের আবেগে পড়ে ধ্বংস হবে জীবনের বহু মূল্যবান সময়; অবাস্তব কল্পনাবিহারে নষ্ট হবে

সুন্দর ও স্বচ্ছ স্মৃতি ও বুঝশক্তি। আর কামনার দহন ও কামড়ে নিপীড়িত হবে সুস্বাস্থ্য। ফলে উপর-পড়া ঐ সতীনের ঈর্ষায় ইল্ম যে তালেবের নিকট থেকে 'খোলা তালাক' নিয়ে বিদায় নেবে তা বলাই বাহুল্য।

আবু হামেদ বলেন, যদি তুমি বল যে, 'কত অসৎচরিত্রের তালেবে ইল্ম ইল্ম অর্জন করেছে। (পাক্কা আলেম হয়েছে) তাহলে?' কিন্তু প্রকৃত উপকারী, পরকালে ফলপ্রদ এবং সৌভাগ্য আনয়নকারী ইল্ম থেকে তারা বহু দূরে। যেহেতু এই ইলমের অগ্রভাগে সেই মন-মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ হবে যাতে তালেবে ইল্ম পাপাচরণকে সর্বনাশী ও সর্বহারী হলাহল জানবে। অথচ তুমি কি দেখেছ যে, প্রাণহারী গরল জানা সত্ত্বেও কেউ তা ভক্ষণ করছে? তুমি যা ঐ শ্রেণীর আলেমদের নিকট থেকে শুনে থাক তাতো মুখের কথামাত্র যা ওরা কখনো তাদের জিহ্বা দ্বারা শোভন করে প্রকাশ করে থাকে আবার কখনো তাদের অন্তর দ্বারা তা প্রত্যাখ্যান করে থাকে। আর তা ইল্মের কোন অংশই নয়।

ইবনে মাসউদ বলেন, 'অধিক রেওয়ায়েত (বর্ণনা করা)ই ইল্ম নয়। ইল্ম তো এক জ্যোতি যা হৃদয়ে প্রক্ষিপ্ত হয়।' অনেকে বলেন, ইল্ম তো আল্লাহভীতির নাম। যেহেতু আল্লাহ তাআলা বলেন, "আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে ওলামাগণই তাঁকে ভয় করে থাকে।" *(সূরা ফাতির ২৮)* সম্ভবতঃ তাঁরা ইলমের বিশেষ সুফলের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এই জন্যই কিছু গবেষক উলামা বলেন, কিছু উলামার এই উক্তি, 'আমরা গায়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে ইল্ম শিখলাম; কিন্তু ইল্ম আল্লাহর উদ্দেশ্যেই হওয়া ছাড়া অন্য কিছুর উদ্দেশ্যে হতে অস্বীকার করল' এর অর্থ; ইল্ম আমাদের হৃদয়ে আসতে অসম্মত হল এবং অস্বীকার করল। ফলে তার প্রকৃতত্ব আমাদের নিকট উদ্ঘাটিত হল না। আমরা যা অর্জন করলাম তা হলো, শুধু তার বাক্য এবং শব্দাবলী। *(ইহয়াউ উলূমিদ্দীন ১/৪৯)*

সুতরাং তালেবে ইলমের উচিত ভিতর-বাহিরকে পরিষ্কার করা। যা কিছু শিখবে তার আদর্শকে নিজের উপর সর্বাগ্রে কার্যকর করা। এতে তার হৃদয়ে ইল্মের আলো উদ্ভাসিত হবে; জ্ঞানপুষ্প বিকশিত হবে এবং হিকমত ও প্রজ্ঞার খনিদ্বার উন্মুক্ত হবে। আর তা হল আল্লাহর অনুগ্রহ। তিনি যাকে ইচ্ছা তাঁর অনুগ্রহ বিতরণ করে থাকেন এবং তিনি মহান অনুগ্রহশীল।

ইলমের পথ এমন এক পথ; যে পথে চলতে ধৈর্য চাই, বিসর্জন চাই, চাই বিভিন্ন অভ্যাস, আচার-আচরণ বর্জন করা, বহু সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং বহু বাধা-বিপত্তি উল্লংঘন করার ক্ষমতা। ইলমের পথ এমন পথ, যে পথে চিরাচরিত প্রথা ও লৌকিকতা চুরমার হয়ে যায়। বাপ-দাদার পালিত আচার অনুষ্ঠানকে সমাধিস্থ করতে হয়। গুপ্ত ও প্রকাশ্য পাপের প্রতিবন্ধকসমূহকে ডিঙিয়ে চলতে হয়। শির্ক, বিদআত ও গোনাহর অবরোধ ভেঙ্গে আল্লাহর নৈকট্যের প্রতি ধাবিত হতে হয়। তওহীদ দ্বারা শির্কের বেড়া ভেঙ্গে, সুন্নাহ দ্বারা বিদআতের বাঁধ ভেঙ্গে এবং শুদ্ধ তওবা দ্বারা গোনাহ ও পাপাচরণের বেষ্টন ভেদ করে অগ্রসর হতে হয়।

সেই সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতে হয় যা আল্লাহ ও তাঁর রসূল ব্যতীত অন্যের সাথে হৃদয়কে আবিষ্ট করে। পার্থিব সুখ-সম্ভোগ, কামনা-বাসনা, নেতৃত্ব ও গদি-লোভ, মানুষের সহিত গাঢ় সংস্রব প্রভৃতি পশ্চাতে ত্যাগ করে আসতে হয়। তবেই সে পথে চলা সহজ হয়। তবেই পাওয়া যায় প্রিয়তম ইলমের সাক্ষাৎ ও তার মিলন-স্বাদ। সকল প্রিয়তমের বিরহে ব্যথিত হলে, সকল প্রিয় বস্তু বিরাগভাজন হলে তবেই ইলম তার অভিমান ছেড়ে নিজ মিলন দেয়। নচেৎ ঈর্ষার সাথে দূর হতেই সালাম দিয়ে প্রস্থান করে।

ইল্‌ম-প্রেমী তালেবে ইল্‌মের নিকট ইল্‌ম ছাড়া অন্যকিছু প্রিয় নয়। তাইতো প্রিয়র উদ্দেশ্যে সকল কিছুকে উৎসর্গ করে। পার্থিব ভোগ-বিলাস, স্ত্রী-সংসর্গ সুখ, পিতামাতার স্নেহছায়া, সন্তান-সন্ততির মায়া-মমতা ভাই বন্ধুদের সাহচর্য প্রভৃতি অনায়াসে ত্যাগ করে ইলমের প্রেম বহাল রাখে। কারণ, পার্থিব সুখ-সম্ভোগ তো মাত্র কয়দিনের। সব নিঃশেষ হয়ে যাবে নিশ্বাস বন্ধ হলেই। আজকের যে সাথী কাল তো সে আমার সাথে থেকে কোন উপকার করবে না। অতএব সবকিছু মিছা মায়া মরীচিকা।

ইমাম আহমদ (রঃ) বলেন, 'যখন মরণের উল্লেখ করা হয় তখন পার্থিব সবকিছু তুচ্ছ মনে হয়। দুনিয়া তো কয়দিনের খাওয়া-পরার নাম মাত্র।'

আশআস বিন রবী' বলেন, আমাকে শো'বা বললেন, 'তুমি তোমার ব্যবসা ধরে থাকলে, ফলে তুমিই সফল ও কৃতার্থ হলে। আর আমি হাদীস (শিক্ষা) ধরে থাকলাম, ফলে আমি নিঃস্ব হয়ে গেলাম।'

সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ বলেন, আমি শো'বাকে বলতে শুনেছি যে, 'যে ব্যক্তি হাদীস সন্ধান করে সে নিঃস্ব হয়ে যায়। আমিও নিঃস্ব হয়ে গেছি। শেষ পর্যন্ত আম্মার একটি তশতরি সাত দীনারে বিক্রয় করেছি।'

জনৈক আরবী কবী বলেন,

: +

+

অর্থাৎ, আমি অভাবকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, 'তুমি কোথায় বাস কর?' সে বলল, 'ফকীহদের পাগড়ীতে। আমার ও তাঁদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব-ভাব আছে। আর সে ভ্রাতৃত্ব-ভাব ত্যাগ করা আমার জন্য কঠিন।' *(উলুউবুল হিম্মাহ ১৫৯ পৃঃ)*

ত্বাহহান বলেন, 'শো'বার উক্তি এবং তার পরবর্তী উক্তিসমূহের উদ্দেশ্য এই নয় যে, তিনি পার্থিব সম্পদ লাভ না করতে পেরে আক্ষেপ করছেন। তিনি তো দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত ও দানশীল ছিলেন। যেমন তাঁর উদ্দেশ্য এও ছিল না যে, তিনি হাদীস শিক্ষা হতে সকলকে বিমুখ করতে চান। বরং তিনি তাঁর ঐ সমস্ত উক্তি দ্বারা সেই বাস্তবতার উল্লেখ করতে চেয়েছেন যা তাঁর জীবনে ঘটেছে। দ্বিতীয়তঃ তিনি তাঁর হাদীস সন্ধানী ছাত্রদেরকে উপদেশ দিতে চেয়েছেন; যারা হাদীস সন্ধানে তাদের সমস্ত সময় ব্যয় করে থাকে; ফলে এমন অর্থ উপার্জন করতে পারে না যাতে তারা নিজেদের অভাব এবং পরিজনের প্রয়োজন মিটাতে পারে। আর তার কারণেই তারা সমাজের বোঝা রূপে প্রকাশ পায়, ফলে সমাজের নিকটে তাদের কদরও হ্রাস পায়। তাই তিনি চেয়েছেন যে, তারা হাদীসও শিক্ষা করুক এবং তার সাথে পেট চালাবার মত কোন অন্নসংস্থানেরও উপায় অনুসন্ধান করুক।' *(জামে' এর টীকা ১/৯৯)*

তদনুরূপ সুফিয়ান বিন উয়াইনার উক্তি, 'এই মস্যাধার যে গৃহে প্রবেশ করবে সে গৃহের পরিবারকে অভাগা করে ছাড়বে।'

একথা বলে তিনি সেই বাস্তবরূপ ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন, যা ঐ মস্যাধার দ্বারা হাদীস লিখায় সংঘটিত হয়ে থাকে। হাদীস লিখায় সময় নিঃশেষ হলে অর্থোপার্জনের জন্য আর সময় হয় না। যার ফলে অর্থাভাবে মুহাদ্দিস ও তার পরিবার বড় কষ্টে কালাতিপাত করেন।

ইবনে জামাআহ (রঃ) বলেন, 'তালেবে ইলমের উচিত, তার যৌবনকাল এবং জীবনের ফুরন্ত সময়কে ইলম অর্জনে সত্বর ব্যবহার করা এবং দীর্ঘসূত্রতা ও দীর্ঘ-

প্রত্যাশার ধোকায় প্রতারিত না হওয়া। যেহেতু আয়ুর যে কাল অতিবাহিত হয় তার কোন পরিবর্ত নেই, কোন বিনিময় নেই।

ইল্‌ম অন্বেষণ থেকে ব্যস্তকারী সম্পর্ক ও বাধাকে যথাসম্ভব ছিন্ন ও উল্লংঘন করে চলবে। নিজের আপ্রাণ প্রচেষ্টা এবং যত্নশক্তিকে তাতে ব্যয় করবে। যেহেতু অপ্রয়োজনীয় সম্পর্ক ও বাধা ইত্যাদি চলার পথে লুটেরার ন্যায়। এই জন্য সলফে সালেহীন পরিবার-পরিজন ও স্বদেশ ছেড়ে দূরে প্রবাসে থাকাকে পছন্দ করেছেন। কারণ স্বগৃহে ও সংসারে আলিপ্ত থেকে পড়া-শুনা করলে গৃহ ও সংসারের চাপ সইতে হয় এবং তার সুখ-দুঃখে প্রায় অন্যের সমান ভাগী হতে হয়। আর চিন্তাশক্তি বিভিন্ন বিষয়ে ভাগাভাগি হলে ইল্‌মের প্রকৃতবাস্তব এবং তত্ত্বের রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পরিপূর্ণ সহায়তা করতে পারে না। আর আল্লাহ কোন মানুষের মধ্যে দুটি হৃদয় সৃষ্টি করেন নি।'

খতীব বাগদাদী বর্ণনা করেন যে, ওলামাদের অনেকেই বলেন, 'এই ইল্‌ম কেবল সেই লাভ করে থাকে যে তার দোকানকে অচল করেছে, বাগানকে পতিত করেছে, ভ্রাতৃবর্গ ত্যাগ করে বিদেশে গেছে এবং অতি নিটাত্মীয় কেউ মারা গেলেও তার জানাযায় শরীক হতে পারেনি।' এসব কিছুতে যদিও অতিরঞ্জন রয়েছে তবুও উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, ইলম শিক্ষায় মনকে স্থির করা এবং চিন্তাশক্তিকে এক করা আবশ্যক। *(তাযকিরাতুস সামে' অলমুতাকাল্লিম ৭০ পৃঃ)*

পক্ষান্তরে সম্পর্কছিন্নতার উদ্দেশ্য এই নয় যে, জ্ঞাতিবন্ধন ছিন্ন করবে, সন্তান-সন্ততিদেরকে অসহায় অবস্থায় ত্যাগ করবে অথবা অর্থোপার্জন করা থেকে বিরত হবে এবং লোকদের দ্বারস্থ হয়ে ফিরবে -কেউ তাকে দেবে, কেউবা রিক্ত-হস্তে ফিরিয়ে দেবে। যেহেতু ভিক্ষাবৃত্তি ইসলামে ঘৃণ্য। সামর্থ্য থাকতে যাচনা করা অবৈধ। পরন্তু 'অন্ন-চিন্তা চমৎকারা।' সুতরাং যার সেই চিন্তাই অবশিষ্ট থেকে যাবে তার ইল্‌ম চিন্তায় নিশ্চয়ই ব্যাঘাত ঘটবে। আল্লাহর উপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল (ভরসা) রাখলে তিনি তার রুজীর ব্যবস্থা করেন ঠিকই কিন্তু তার সাথেই কোন হেতু ও উপায় অবলম্বন করতেও শরীয়ত আদেশ করে।

যার জন্য আমার একাধিক নিঃস্ব সহপাঠী ছিলেন, যাঁরা মাদ্রাসার ছুটি হলে মজদুরী করে অর্থোপার্জন করতেন। বলতেন, 'খেটে খেতে লজ্জা কি? লোকের নিকট হাত পাতা থেকে তো অনেক ভালো। হাত পাতা তো বড় লজ্জার কাজ। বিশেষ করে

সমাজের কাছে 'ফকীরী বিদ্যা' বলে আমাদের বিদ্যার বদনাম রয়েছে। ছুটির সময় পয়সা না কামালে পড়ার সময় দুশ্চিন্তায় পড়া মাথায় ঢোকে না।'

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন, 'সে ব্যক্তির সহিত পরামর্শ করো না যার ঘরে আটা (ভাত) নেই। কারণ সে তো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত জ্ঞানহারা।'

সুতরাং সম্পর্ক ও আসক্তি ছিন্ন করার অর্থ হল এমন ব্যস্ততা আনয়নকারী বস্তু বা ব্যক্তি হতে দূরে থাকা যার সে একান্ত মুখাপেক্ষী নয়। অতএব সে এমন বস্তু ও বা কর্ম হতে বিমুখ হতে পারে না যা ব্যতিরেকে তাকে অন্যের দ্বারস্থ হতে হয়। এর সহিত আসল লক্ষ্য ও প্রচেষ্টা হয় ইল্‌ম শিক্ষা, কিন্তু উপলক্ষ্য ও সহায়ক হয় অন্নসংস্থান। যেহেতু ইলমের জন্য অন্তরকে শূন্য না করলে এবং সম্পূর্ণ সামর্থ্য ব্যয় না করলে ইলম ধরা দেয় না। যেমন আবু ইউসুফ কাযী (রঃ) বলেন, 'ইল্‌ম এমন এক জিনিস, যতক্ষণ পর্যন্ত না ওকে তুমি তোমার সবকিছু দান করেছ ততক্ষণ পর্যন্ত ও তোমাকে ওর কিছুও দান করবে না। তাকে তুমি তোমার যথাসর্বস্ব দিলে সে তোমাকে ধোকার আশঙ্কাসহ তার কিঞ্চিৎ দান করবে।'

অতএব সংসার চলার ব্যবস্থা না করে দ্বীনী ইল্‌ম পড়তে শুরু করা যেন খেলা শুরু করা। যেহেতু তাতে তার মন পড়াশুনায় থাকে না; থাকে সংসারের দিকে। পড়াতে মন বসালেও সংসারের অন্যান্য পরিজনরা কষ্ট ও দুঃখ পায়। অথচ রসূল ﷺ বলেন, "সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ অর্থ; যা মানুষ তার পরিবারের উপর খরচ করে।" *(মুসলিম)*

অন্য এক হাদীসে তিনি বলেন, "মানুষের গোনাহগার হওয়ার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, তার উপর যার রুজীর দায়িত্ব আছে তার রুজী সে বন্ধ করে। *(মুসলিম)*

এ জন্যই সুফিয়ান সওরী (রঃ) এর নিকট কোন লোক ইল্‌ম অন্বেষণের উদ্দেশ্যে এলে তাকে জিজ্ঞাসা করতেন, 'তোমার জীবিকা ব্যবস্থা আছে কি?' যদি সে উত্তরে জানাত যে, 'হ্যাঁ, তার যথেষ্ট জীবিকা আছে' তাহলে তাকে ইল্‌ম শিখতে আদেশ দিতেন। নচেৎ অন্নসংস্থান করতে হুকুম করতেন। *(আল জামে' লিআখলাকির রাবী অআদাবিস সামে' ১/৯৮)*

বহু সলফ ছিলেন যাঁরা অভাব সত্ত্বেও ইল্‌ম অর্জনকে প্রাধান্য দিতেন তার ব্যাখ্যা এই যে, নিজের জন্য এবং পরিবারের জন্য জীবিকা যথেষ্ট থাকলে আর খুব প্রয়োজনীয় নয় এমন অর্থের দিকে আসক্তি না বাড়িয়ে ইলম সন্ধানে মনোযোগী হওয়া দরকার। যেহেতু দুনিয়ার ভোগ-বিলাস সন্ধানে নিমজ্জিত হওয়া, পার্থিব

সুখসামগ্রীতে লালসা করা এবং প্রয়োজনাধিক অর্থ সঞ্চয়ে মূল্যবান সময় ব্যয় করাটাই নিন্দিত।

সাহাবাবর্গের অন্যতম প্রধান আলেম হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) কেবল নিজের পেটের খোরাক যোগাড় করে ইলমের জন্য রসূল ﷺ এর সাহচর্যে অহরহ পড়ে থাকতেন। চাষ-বাস, ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থ সঞ্চয় প্রভৃতি কিছুই তাঁর অটল মনকে ইল্ম হতে অপসারণ করতে পারেনি। একদা নবী ﷺ তাঁকে বললেন, 'তুমি কি এই গনীমতের মাল থেকে কিছু চাও না; যা তোমার সাথীরা চেয়েছে?' উত্তরে তিনি বললেন, 'আমি আপনার নিকট এই চাইছি যে, আল্লাহ আপনাকে যা শিখিয়েছেন তা আপনি আমাকে শিখিয়ে দিন!'

তাই তো তিনি সবচেয়ে বেশী হাদীস মুখস্থ ও বর্ণনা করতে পেরেছেন।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রঃ) ইলমের খাতিরেই চল্লিশ বছর বয়স হলে তারপর বিবাহ করেছিলেন। অনেকে তো জীবনে বিবাহই করেননি।

আবু বাকার আম্বারীকে এক ক্রীতদাসী উপহার দেওয়া হল। যখন দাসী তার নিকট ছিল তখন তিনি একটি মাসআলা (সমস্যা)র সমাধান খুঁজে বের করছিলেন কিন্তু তা বিস্মৃত হয়ে গেল। তিনি দাসীর প্রতি ইঙ্গিত করে পরিবারের লোককে বললেন, 'একে দাস ব্যবসায়ীর নিকট বের করে নিয়ে যাও।' দাসীটি বলল, 'আমার কোন কি অপরাধ হয়েছে?' তিনি বললেন, 'কিন্তু আমার অন্তর তোমার সহিত নিবিষ্ট হয়ে পড়েছে। আর তোমার মত দাসীর কি দাম রয়েছে যে, আমার ইলমে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে।?' *(মুখতাসারু মিনহাজিল কাসেদীন ১৪পৃঃ)*

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি (বহু কিছুর) মালিক হয়ে এবং আত্মমর্যাদা কামনা করে এ ইলম শিক্ষা করতে চায় সে সফলকাম হয় না। কিন্তু যে আত্মাকে লাঞ্ছিত করে, জীবিকা সঙ্কীর্ণতায় ধৈর্য ধরে এবং ওলামাদের সেবা করে শিক্ষা করে সে সফলকাম হয়।'

ইমাম মালেক বিন আনাস (রঃ) বলেন, 'কোন ব্যক্তিই এই ইলমের অভীষ্ট চূড়ায় ততক্ষণ পৌঁছতে পারে না যতক্ষণ না সে দৈন্য দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ইল্মকে প্রত্যেক বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছে।' *(আল-ফক্বীহ অলমুতাফাক্কিহ ২/৯৩)*

তালেবে ইলমের পরিজনের উচিত, ইলম অনুসন্ধানে তাকে যথার্থ সহযোগিতা করা, যথাসময়ে খরচ-পাতি দেওয়া এবং বাড়ির কাজে তাকে ব্যবহার করে তার পড়াশোনা নষ্ট না করা। আল্লাহর রসূল ﷺ এর যুগে দুই ভাই ছিল। একজন নবী ﷺ

এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর হাদীস ও ইল্‌ম শিক্ষা করত। অপরজন কোন হাতের কাজ করে অর্থ উপার্জন করত। একদা এই শিল্পী ভাই নবী ﷺ এর নিকট হাজীর হয়ে অভিযোগ করল যে, তার ঐ (তালেবে ইলম) ভাই তার শিল্পকাজে কোন প্রকার সহায়তা করে না। তা শুনে তিনি তাকে উত্তরে বললেন, "সম্ভবতঃ তুমি ওরই (ইল্‌ম শিক্ষার বর্কতে) রুযী পাচ্ছ!" *(তিরমিযী ২৩৪৬, সিঃ সহীহাহ ২৭৬৯নং)*

আর তালেবে ইলমের এই বলে সন্তুষ্ট হওয়া উচিত,

+

+

অর্থাৎ, আমাদের জন্য ইল্‌ম এবং জাহেলদের জন্য মাল; আমরা পরাক্রমশালী (আল্লাহর) এই ভাগ্য-বন্টনে সন্তুষ্ট। কারণ, মাল তো অদূর ভবিষ্যতে ধ্বংস হতে পারে, কিন্তু ইল্‌ম চিরকাল থাকবে; তা ধ্বংস হবার নয়।

স্বল্প ভোজন, শয়ন ও কথন

পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, তালেবে ইলমের উচিত, হালাল রুজী হতে পরিমিত আহার করা; যে অভ্যাস রসূল ﷺ ও তাঁর অনুসারীদের।

তদনুরূপ পরিমিত নিদ্রা যাওয়া। শরীর ও মস্তিষ্কের ক্ষতি না হলে তালেবে ইল্‌ম যথাসম্ভব কম ঘুমাবে। দিবা-রাত্রে আট ঘন্টার অধিক এবং ছয় ঘন্টার কম অবশ্যই নিদ্রিত থাকবে না; নচেৎ ইল্‌ম যাবে অথবা সুস্থতা। যেমন দ্বিপ্রহরের সময় একটু বিশ্রাম ব্যতীত দিবা-নিদ্রাও এক কামজ দোষ। দ্বিপ্রহরের বিশ্রামের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "তোমরা দুপুর বেলায় একটু ঘুমিয়ে বিশ্রাম নাও। কারণ, শয়তানরা ঐ সময় বিশ্রাম নেয় না।" *(সহীহুল জামে' ৪৪৩১নং)*

হাসান বিন যিয়াদ (রঃ) ফিক্‌হ শিক্ষা করতে শুরু করলেন, তখন তাঁর বয়স আশি বছর। (ইল্‌ম শিক্ষার সময়) তিনি চল্লিশ বছর বিছানায় রাত্রি কাটাননি।

যুবাইর বিন আবী বকর বলেন, 'একদা আমার ভাগ্নী আমার স্ত্রীকে বলল, আমার মামা মামীর পক্ষে কত ভালো মানুষ; মামীর উপর সতীন আনেনি, আর কোন দাসীও ক্রয় করেনি। তা শুনে স্ত্রী তাকে বলল, 'আল্লাহর কসম, এই বইগুলো আমার পক্ষে তিনটে সতীনের চেয়েও অধিক কঠিন!' *(আল-জামে' লিআখলাকির রাবী আদাবিস সামে' ১/৯৯)*

মুহাম্মদ বিন হাসান শাইবানী (রঃ) রাত্রিকালে ঘুমাতেন না। নিজের পাশে সর্বদা খাতা-পত্র রেখে নিতেন। যখন একটি বিষয় দেখতে দেখতে বিরক্ত হয়ে যেতেন তখন তা ছেড়ে অন্য বিষয় দেখতে শুরু করতেন। নিজের কাছে এক গ্লাস পানিও রাখতেন। নিদ্রা এলে পানি দ্বারা দূর করতেন। তিনি বলতেন, 'নিদ্রা উষ্ণতা থেকে সৃষ্টি হয় তাই তা শীতল পানি দ্বারা দূর করা উচিত।' *(তা'লীমুল মুতাআল্লিম ২৩ পৃঃ)*

রসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন শয়তান তার মস্তকের শেষাংশে তিনটা গিরা বেঁধে দেয়। প্রত্যেক গিরার স্থানে বলে, 'তোমার জন্য এখনও লম্বা রাত বাকী, ঘুমাও।' সুতরাং সে যদি উঠে আল্লাহর যিক্র করে তাহলে একটি গিরা খুলে যায়। অতঃপর যদি অযু করে তবে আরও একটি গিরা খুলে যায়। অতঃপর যদি সে নামায পড়ে তাহলে তার অপর গিরাটিও খুলে যায়। তখন সে স্ফূর্তির সহিত সুস্থ মনে সকালে উঠে। নচেৎ অসুস্থ মনে অলসতার সহিত সকাল করে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

যে ব্যক্তি সারা রাত্রি নিদ্রায় কাটায় এবং নামাযের জন্য উঠে না সে ব্যক্তি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "শয়তান তার কানে প্রস্রাব করে দেয়।"

আল্লাহ জাল্লা শানুহ মুত্তাকী ও সৎলোকদের প্রশংসা করে বলেন, "তারা রাত্রের সামান্য অংশই নিদ্রায় অতিবাহিত করত এবং রাত্রির শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত।" *(সূরা যারিয়াত ১৭-১৮ আয়াত)*

স্থুলকথা এই যে, অতিনিদ্রা তালেবে ইলমের গুণ নয়। অবকাশ এলে ঘুমিয়ে আশা মিটানো তার স্বভাব নয়। তার গুণ ও স্বভাব তো সর্বদা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ইল্মের আশায় প্রযত্ন ও প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। মুমিন পারলৌকিক কল্যাণ পেয়ে কোনদিন তৃপ্ত হয় না। যত কল্যাণ, যত পুণ্য সে পায় তত তার পাওয়ার আকাংখা আরো বৃদ্ধি হতে থাকে। পরিশেষে সে জান্নাতে গিয়ে শেষবারের মত তৃপ্তিলাভ করবে।

অনুরূপভাবে তালেবে ইলমের আর এক সদ্‌গুণ হল, অল্প কথা বলা। নবী ﷺ সকল মুসলিমের উদ্দেশ্যেই বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী সে যেন উত্তম কথা বলে; নচেৎ চুপ থাকে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

সুতরাং গপে বা বখাটে হওয়া কোন মুসলিমের সদ্‌গুণ নয়; যা একজন তালেবে ইল্মের যে হতেই পারে না তা অনুমেয়।

ইবনে আবুল বার্র বলেন, 'আলেমের ফিতনার মধ্যে এটাও একটি যে, তার নিকট শ্রবণ অপেক্ষা বচন প্রিয়তর হয়।' এ কথা ইয়াযীদ বিন আবী হাবীব হতে বর্ণিত।

তিনি আরো বলেন, 'মনোযোগ সহকারে শ্রবণে নিরাপত্তা আছে এবং তাতে ইল্‌ম বৃদ্ধি হয়। আবার শ্রোতা বক্তার শরীক। আর কথা বলায় দুর্বলতা প্রকাশ, শোভন এবং বৃদ্ধি-হ্রাস করণের ব্যাপার থাকে। বক্তা ফিতনার সম্মুখীন হয়। পক্ষান্তরে নীরব-প্রকৃতির ব্যক্তির জন্য রহমত অপেক্ষা করে।'

আবু যাইয়াল বলেন, 'নীরবতা শিখ; যেমন কথা বলা শিখছ। যেহেতু কথা যদি পথপ্রদর্শন করে তাহলে নীরবতা তোমাকে রক্ষা করবে। নীরবতায় তুমি দু'টি লাভ পাবে; প্রথমতঃ তুমি তদ্দ্বারা তোমার থেকে যে বড় আলেম তাঁর ইল্‌ম অর্জন করবে এবং দ্বিতীয়তঃ তোমার থেকে যে বড় জাহেল তার জেহালতী (মূর্খামী) থেকে পরিত্রাণ পাবে।'

অবশ্য সর্বদা নীরবতা পছন্দনীয় নয়। যেখানে কথা বলার প্রয়োজন আছে; কথা না বললে কারো অধিকার বিনষ্ট হবার আশঙ্কা আছে এবং যেখানে চুপ থাকলে কোন ক্ষতি আছে সেখানে অবশ্যই মুখ খুলতে হয়। প্রয়োজনীয় বিষয়ে কথা না বলাও দূষণীয়।

ইবনে আবুল বার্র বলেন, 'উত্তম বিষয়ে কথা বলা গনীমত (বিনা পরিশ্রমে লব্ধ সম্পদ), এবং তা নীরবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যেহেতু নীরবতায় বড় জোর কেবল নিরাপত্তা আছে। কিন্তু উত্তম কথা বলায় গনীমত রয়েছে। অনেকে বলেছেন, "যে কল্যাণ বিষয়ে কথা বলে সে গনীমত অর্জন করে এবং যে নিশ্চুপ থাকে সে নীরাপদ থাকে।" আবার ইল্‌ম বিষয়ে কথা বলা অন্যতম শ্রেষ্ঠ আমল। যা যিক্‌র ও তেলাঅতের পর্যায়ভুক্ত; যদি তাতে উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি, মূর্খতা দূরীকরণ এবং প্রকৃত অর্থাবলী উপলব্ধিকরণ হয়।' *(জামেউ বায়ানিল ইল্‌ম অফাযলিহ ১৮২ পৃঃ)*

এক ব্যক্তি হযরত সালমান (রাঃ)এর নিকট এসে বলল, 'হে আবু আব্দুল্লাহ! আমাকে উপদেশ দিন।' তিনি বললেন, 'তুমি কথা বলো না।' লোকটি বলল, 'যে লোকদের মাঝে বাস করে সে কথা না ব'লে পারে না।' বললেন, 'যদি তুমি কথা বল তাহলে উচিত কথা বলো নচেৎ চুপ থেকো।' লোকটি বলল, 'আরো উপদেশ দিন।' বললেন, 'রাগান্বিত হয়ো না।' বলল, 'আপনি আমাকে রাগ না করতে আদেশ দিলেন। কিন্তু তা তো আমাকে ছেয়ে ফেলে এবং সংবরণ করতে পারি না।' তিনি বললেন, 'তাহলে রাগান্বিত যদি হও তবে তোমার জিহ্বা ও হাতকে সংযত রেখো।' লোকটি বলল, 'আরো বৃদ্ধি করুন।' তিনি বললেন, 'লোকদের সহিত মিলামিশা করো না।' লোকটি বলল, 'যে ব্যক্তি লোক-সমাজে বাস করে সে তাদের সহিত না

মিশে পারবে না।' তিনি বললেন, 'যদি তুমি মিশ তাহলে কথা সত্য বলো এবং সকলের আমানত আদায় করো।' *(কিতাবুস স্বামত অ আদাবিল লিসান ৫৫৮পৃঃ)*

মোট কথা, তালেবে ইলমের উচিত জিহ্বাকে সংযত করা, যেহেতু এই জিহ্বাতে রয়েছে শতাধিক বিপদ। যেমন, অনর্থক বাজে কথা বলা, পাপ ও অসৎ আলোচনা করা, কষ্টকল্পনার সাথে ছন্দ বা উচ্চ ভাষা প্রয়োগ করে কথা বলা। অশ্লীল গালি ও অসার বাক্য বলা, উপহাস ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা , কারো ভেদ ফাঁস করা, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা, কথা দ্বারা কাউকে আঘাত করা, মিথ্যা বলা ও মিথ্যা কসম খাওয়া, গীবত করা, চুগলী করা, দু'মুখে কথা বলা, সামনে কারো প্রশংসা করা, ভুল ও ভিত্তিহীন কথা বলা ইত্যাদি; যেসব হতে বিশেষ করে তালেবে ইল্‌মকে এবং সাধারণভাবে সকল মুসলিমকে অবশ্যই দূরে থাকতে হয়। এসবের প্রত্যেকটিই যে বড় বড় সর্বনাশ ডেকে আনে তা প্রত্যেক অভিজ্ঞ লোকই জানেন। বিশেষ করে গীবত এত নোংরা কাজ এবং এত বড় সর্বনাশী পাপ যে, তা সমাজের মানুষের মাঝে ঐক্য ও সংহতি, সম্প্রীতি ও সদ্ভাব এবং পরস্পরের সহযোগিতায় ঘুণ ধরিয়ে দেয়। কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় যে, সেই মহা পাপ আলেম সমাজের মধ্যেই অতি বেশী। এরই সাহায্যে এক ভাই অপর ভাই-এর সম্ভ্রম লুটে, নিজের 'হাম বড়াই' প্রকাশ করে এবং মৃত ভাই-এর মাংস খেয়ে থাকে।

যার জন্য উকবা বিন আমের (রাঃ) রসূল ﷺ কে পরিত্রাণের উপায় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছিলেন, "তোমার জিহ্বাকে সংযত রাখ।"

অনুরূপ হযরত মুআয (রঃ) কে নসীহত করে বলেছিলেন, "তুমি এ (জিহ্বাকে) সংযত রাখ।" মুআয বলেছিলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা যা কথা বলি তাতেও কি আমরা ধৃত হব (আমাদেরকে কৈফিয়ত করা হবে?)' তিনি বললেন, "তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক, মানুষের মুখের কর্তিত (অন্যায়ভাবে কথিত) বিষয় ছাড়া অন্য কিছু কি তাদেরকে মুখ ছেঁচড়ে জাহান্নামে ফেলবে?" *(লেখকের 'জিভের আপদ' দ্রষ্টব্য)*

সুতরাং তালেবে ইলমকে এ বিষয়ে অত্যন্ত সাবধান হওয়া উচিত। নচেৎ তার ইল্‌মের অবস্থা এমন হবে যে, 'বাড়ে পড়বে ঢোঁরে খাবে।'

যেমন নিম্নের সতর্কবাণীগুলোও সর্বদা স্মরণে রাখবেঃ-

অভিজ্ঞরা বলেছেন, 'চারটি জিনিসে বিস্মৃতি জন্মে; প্রায় সর্বদা টক খাওয়া, অধিকাধিক নিদ্রা যাওয়া, শোকার্ত হওয়া এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়া।'

'অতি সহবাস। যৌনচিন্তা, হস্তমৈথুন, নির্জনতা, অবৈধ প্রেম, অতিহাস্য এবং দুঃখ-চিন্তা স্মৃতিশক্তি ও জ্ঞানের পরিসর হ্রাস করে দেয়।'

চারটি কাজে বুদ্ধি বাড়ে; হৃদয় ও মনকে মানসিক চিন্তা হতে খালি রাখা, (যেহেতু 'ব্যাধির চেয়ে আধিই হল বড়') পরিমিত পানাহার করা, উপযুক্ত খাদ্য খাওয়া এবং যথা সময়ে শরীরের অতিরিক্ত বস্তু পরিত্যাগ করা।'

উচিত সংস্রব

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন,

+

অর্থাৎ, দুনিয়াকে সালাম জানাও (বিদায় দাও), যদি না তথায় কোন সত্যবাদী, ওয়াদা পালনকারী (বিশ্বস্ত) ও ন্যায়পরায়ণ বন্ধু থাকে।

সমাজে মিলেমিশে একত্রে বাস করা মানুষের নৈতিক ও প্রাকৃতিক গুণ। পাড়া-প্রতিবেশীর লোক, ভাই-বন্ধু ইত্যাদির সহিত মিশতে হয়। বন্ধুদের মধ্যে কেউ হয় জানী (প্রাণের), কেউ হয় নানী (খাবার-দাবারের) এবং কেউ হয় জবানী (মুখের) বন্ধু ও সাথী। এই তিন প্রকার সাথীদের মধ্য থেকে তালেবে ইল্‌মকে এমন সাথী নির্বাচিত করতে হয়, যার কারণে নিরর্থক তার সময় নষ্ট না হয় অথবা প্রভাবে সঙ্গ-দোষে সেও দূষিত না হয়ে যায়। সুতরাং জ্ঞানী, মেধাবী, নিষ্ঠাবান ও উপকারী বন্ধু নির্বাচন করে নিজের ইল্‌ম ও আমলে বৃদ্ধি সাধন করা উচিত। এমন সঙ্গী থেকে দূরে থাকা উচিত, যার দ্বারায় তার জ্ঞান, মান, প্রাণ, ধন ও ঈমানের কোন ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। মৃত হৃদয়ের সঙ্গী থেকে নিঃসঙ্গ থাকা বহু উত্তম।

ইবনুল কাইয়েম (রঃ) বলেন, 'যার হৃদয় মৃত সে তোমার মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করবে, অতএব যথাসম্ভব তার নিকট থেকে দূরে থেকে নিজের মনকে শান্তি দাও। যেহেতু সে উপস্থিত হলেই তুমি আতঙ্কিত হয়ে থাক। অতএব ঐ প্রকার ব্যক্তি দ্বারা মসীবতে পড়লে তুমি ওকে তোমার বাহ্যিক ব্যবহার দাও, হৃদয় নিয়ে ওর নিকট থেকে

পলায়ন কর এবং অভ্যন্তর নিয়ে ওর কাছ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাও। ওকে নিয়ে তুমি ঐ জিনিস থেকে ব্যস্ত হয়ে যেওনা যা তোমার জন্য শ্রেষ্টতম।

জেনে রেখো, সেই ব্যক্তিকে নিয়ে নিবিষ্ট হওয়াতে শত আফশোষ হবে; যে ব্যক্তির সহিত নিবিষ্টতা কেবল আল্লাহ তাআলা হতে তোমার প্রাপ্য অংশ থেকে তোমার জন্য বঞ্চনা ডেকে আনে। তাঁর নিকট থেকে তোমাকে দূরে ঠেলে দেয়, অযথা তোমার সময় নষ্ট করে, সংকল্পকে দুর্বল করে এবং চিন্তাকে বিভিন্নমুখী করে ফেলে। এমন লোকের পাল্লায় যদি তুমি ফেঁসেই থাক আর তাকে তোমার প্রয়োজনও থাকে তাহলে তার মধ্যেই আল্লাহর কাজ করে যাও এবং যথাসম্ভব তার উপর সওয়াবের আশা রাখ। তার মধ্যেই আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির প্রতি নৈকট্য লাভ কর। তার সহিত তোমার সমাবেশকে এমন ব্যবসা বানাও যাতে তুমি যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হও। আর তুমি তার পক্ষে এমন ব্যক্তির মত হও, যে কোন পথে চলতে থাকে, এমন সময় এক ব্যক্তি তার সামনে এসে তাকে চলা থেকে থামিয়ে দেয়। অতঃপর তুমি চেষ্টা কর ওকে তোমার সঙ্গে নিয়ে চলতে। যাতে তুমি ওকে বহন কর এবং ও যেন তোমাকে বহন না করে। তাতে যদি সে অস্বীকার করে ও তোমার সাথে পথ চলতে যদি তার আগ্রহ না থাকে তবে তুমি তার নিকট থেমে যেও না। বরং তাকে বর্জন কর এবং তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করো না। যেহেতু সে তোমার পথ অবরোধকারী (লুটেরা); তাতে সে যেই হোক না কেন। অতএব তুমি তোমার হৃদয় নিয়ে অব্যাহতি লাভ কর। তোমার দিন ও রাত্রি ব্যয় করতে কার্পণ্য কর। আর গন্তব্যস্থলে পৌঁছবার পূর্বেই যেন তোমার পথিমধ্যে সূর্য অস্তমিত না হয়ে যায়, নচেৎ তুমি ধৃত হবে।' *(আল-ওয়া বিলুস সাইয়েব ৪৫ পৃঃ, আদাবু ত্বালেবিল ইল্ম ১১২-১১৩পৃঃ)*

সুতরাং তালেবে ইলমের উচিত, অপ্রয়োজনীয় ও অপকারী সংস্রব ত্যাগ করা এবং সেই সকল সম্পর্কও বর্জন করা যাতে তার দ্বীন ও দুনিয়ায় ক্ষতি হয়। বিশেষ করে নারী জাতির কুহকে না ফাঁসা, যার ফিতনা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ফিতনা এবং যার মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে জ্ঞানী জ্ঞানহারা, মানী মান হারা এবং কতলোক প্রাণহারা হয়। তারুণ্যের প্রারম্ভে সঙ্গতার খোঁজ হলে খোদাভীতির সহিত তালেবে ইল্মকে এমন সঙ্গী নির্বাচন করতে হবে যাতে আল্লাহ সন্তুষ্ট থাকেন এবং ইল্ম-প্রদীপের পার্শ্ববর্তী বেষ্টনী কাঁচে কালিমা না পড়ে যায়। তদনুরূপ এমন সাথীও গ্রহণ করবে না যার খেল-তামাশাই অধিক এবং জ্ঞান-বুদ্ধি-ভিত্তিক কর্মকান্ড অল্প। যেহেতু মানুষের মন এক প্রকার চোর এবং তা চুরিও হয় অতি সত্বর।

অনর্থক সংস্রবের তো কোন লাভই নেই। যাতে নিরর্থক আয়ু ক্ষয় হয়, অর্থ ব্যয় হয়, মানহীন সঙ্গতায় মানও যায় এবং দ্বীনহীন সাহচর্যে দ্বীন হারানোরও আশঙ্কা থাকে। সুতরাং তালেবে ইল্মের উচিত, এমন ব্যক্তির সহিত সংস্রব রাখা যাকে সে উপকৃত করতে পারবে অথবা তার নিকট হতে নিজে উপকৃত হবে। আর যদি এমন কোন ব্যক্তির অযাচিত সংস্রবে পড়েই যায়; যার সহিত বৃথা সময় নষ্ট হয়, না তাকে উপকৃত করতে পারে, না নিজেকে এবং তার ইলমী চলার পথে সে যদি কোন সহায়তা না করতে পারে; বরং বাদ সাধে তাহলে কুপ্রবৃত্তির ঝোঁকে না পড়ে সম্পর্ক গাঢ় হওয়ার পূর্বেই ধীরে ধীরে তার সংসর্গ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। নচেৎ (বিশেষ করে নারী-প্রেম) বিষয় যখন গভীরতায় পৌঁছে যায় তখন তা দূর করা কঠিন হয়ে পড়ে। সুতরাং যখন 'তুলে ফেলা থেকে ঠেলে ফেলা সহজ' তখনই উচিত ব্যবস্থা নেওয়া জ্ঞানীর কাজ।

কোন সাথীর যদি একান্তই প্রয়োজন হয় তাহলে এমন সাথী হওয়া উচিত, যে হবে সৎ, দ্বীনদার, মুত্তাকী, পরহেযগার, বুদ্ধিমান, কল্যাণ-প্রিয়, যার মন্দ খুবই কম, যে সহ্যশীল ও সদ্ভাব-প্রিয়, কথায় কথায় যে তর্ক করে না, যে ভুলে গেলে স্মরণ করায়, স্মরণ করলে সাহায্য করে, প্রয়োজনে প্রবোধ দান করে, কথার আঘাত পড়লে সবর করে, ভুল ধরিয়ে দিলে ভুল স্বীকার করে, বন্ধুত্বের সাথে সমীহও রাখে ইত্যাদি। *(তাযকিরাতুস সামে' ৮৩পৃঃ)*

ইব্রাহীম বিন আদহমকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'আপনি লোকেদের সহিত মিশেন না কেন?' উত্তরে তিনি বললেন, 'কারণ যদি আমি আমার চেয়ে নিচু মানের লোকের সঙ্গে মিশি তাহলে সে তার মূর্খতায় আমাকে কষ্ট দেয়। যদি আমি আমার চেয়ে নিচুমানের লোকের সহিত মিশতে যাই তাহলে সে অহংকার দেখায়। আর যদি আমি সমতুল কোন ব্যক্তির সহিত মিশি তাহলে সে আমার প্রতি হিংসা করে। তাই আমি তাঁর (আল্লাহর) সঙ্গতায় নিরত থাকি যাঁর সঙ্গতায় কোন বিরক্তি নেই, যাঁর মিলনের কোন ছিন্নতা নেই এবং যার সংসর্গে কোন আতঙ্ক নেই।'

জনৈক জ্ঞানী বলেন, 'খবরদার! কোন অহংকারীর সাথী হয়ো না। কারণ, যদি সে তোমার নিকট কোন ভালো দেখে তবে সে তা নিজের নামের সাথে জোড়ার চেষ্টা করবে আর যদি তার নিজের তরফ থেকে কোন মন্দ ব্যক্ত হয়ে পড়ে তবে তা তোমার নামের সাথে জুড়ে দেবে।'

মানুষ চার প্রকারের; প্রথমজনঃ জানে এবং সে জানে যে, সে জানে। তার সাথী হও এবং তাকে জিজ্ঞাসা কর। দ্বিতীয়জনঃ জানে এবং সে জানে না যে, সে জানে। সে বিস্মৃত তাকে স্মরণ করাও। তৃতীয়জনঃ জানে না এবং সে জানে যে, সে জানে না। সে অনুসন্ধানী, সে তোমার সাহচর্য চাইলে তা দাও এবং তাকে শিক্ষা দাও। আর চতুর্থজনঃ জানে না এবং জানে না যে, সে জানে না। এমন ব্যক্তি মূর্খ, তাকে বর্জন কর।

সাথী নির্বাচন করা এবং সংস্রব রাখার সময় কথাগুলি স্মরণে রাখলে তালেবে ইল্‌মকে সত্যিই বিপদে পড়তে হয় না। প্রয়োজন ও কাল-পাত্র বিচার করে সঙ্গী নির্বাচন করা উচিত, নচেৎ তালেবে ইলমের শ্রেষ্ঠ সঙ্গী হল কিতাব।

ইবনে কুদামাহ (রঃ) বলেন, 'জেনে রেখো যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই বন্ধুত্বের যোগ্য নয়। বন্ধুত্ব গড়ার জন্য এমন কতক আচরণ, গুণ ও বৈশিষ্ট্য বন্ধুর মধ্যে থাকা উচিত, যার ফলে বন্ধুত্বে আগ্রহ বাড়ে। তুমি যাকে সঙ্গী ও বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে তার মধ্যে নিম্নের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য থাকা উচিতঃ-

সে যেন বুদ্ধিমান ও চরিত্রবান হয়। ফাসেক, বিদআতী এবং অর্থলোভী না হয়। যেহেতু জ্ঞান তো মানুষের মূলধন, আহম্মক ও নির্বোধের বন্ধুত্বে কোন কল্যাণ নেই। কারণ সে তোমাকে উপকার করতে চাইলেও অপকার করে বসে থাকবে। (প্রশংসা কুড়াবার উদ্দেশ্যে ভক্তির আতিশয্যে ক্ষতি সাধন করেও ভুলের কথা বলতে গেলে বলবে, 'ভালোর কাল নেই।') জ্ঞানী বলতে সেই বন্ধুকে বুঝাতে চাচ্ছি যে সমস্ত বিষয়কে যথার্থভাবে যথোপযুক্তরূপে নিজে নিজেই বুঝে, নচেৎ তাকে বুঝিয়ে দিলে অবশ্যই বুঝে যায়।

অনুরূপভাবে সদাচরণ তো একান্ত আবশ্যক। যেহেতু জ্ঞানী হলেও অনেকে ক্রোধ বা কামনার বশবর্তী হয়ে নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে থাকে। এমন জ্ঞানী বন্ধুর সাহচর্যেও কোন ফল নেই।

ফাসেক যে, সে তো আল্লাহকে ভয় করে না, আর যার বুকে আল্লাহর ভীতি নেই তার বিপত্তি হতে কোন নিরাপত্তা নেই এবং তার উপর আস্থা রাখাও যায় না।

বিদআতীর সংস্রবও বিপজ্জনক। যেহেতু তার মনেও বিদআতের অনুপ্রবেশ ঘটার আশঙ্কা থাকে। অর্থলোভী, দুনিয়াদার এবং স্বার্থপর ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্বও হানিকর। যেহেতু সে স্বার্থের খাতিরে অসময়ে সরে পড়তেও পারে অথবা স্বার্থলোভে বন্ধুর বন্ধুত্বে ছুরি চালাতেও পারে।

হযরত উমর (রাঃ) বলেন, 'তোমরা সত্যবাদীদের সাহচর্য গ্রহণ কর, তাদের ছায়া ও সংস্পর্শে জীবন-যাপন কর। যেহেতু তাঁরা সুখের সময়ের সৌন্দর্য এবং দুঃখের সময়ের হাতিয়ার। নিজের ভাই-এর প্রতি সুধারণা রাখ যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি তার নিকট এমন কান্ড লক্ষ্য করেছ যাতে তুমি ক্ষুব্ধ হও। শত্রু হতে দূরে থাক। আমানতদার ব্যতীত সকল বন্ধু থেকেও সাবধান থাক। আর আমানতদার সেই, যে আল্লাহকে ভয় করে। অপকর্মকারীদের বন্ধু হয়ো না। নচেৎ তুমিও অপকর্ম শিখে নেবে। তাকে তোমার ভেদ ও রহস্য জানাও না। আর তোমার সর্ববিষয়ে তাদের পরামর্শ গ্রহণ কর যারা আল্লাহকে ভয় করে।'

ইয়াহয়্যা বিন মুআয বলেন, 'নিকৃষ্ট বন্ধু সে, যাকে দুআর জন্য আবেদন জানাতে হয়, এক তরফাভাবে সদ্ভাব বজায় রেখে যার সহিত চলতে হয় অথবা কোন কাজে বা ভুলে তার নিকট অজুহাত দেখাতে হয় বা ক্ষমাপ্রার্থী হতে হয়।'

বন্ধুর উপর বন্ধুর অনেক অধিকারও আছে। যেমন, যাচিত ও অযাচিতভাবে তার প্রয়োজন মিটানো, তার দোষ-ত্রুটি গোপন করা, সৎকাজে সতর্ক করা, মন্দ কাজে বাধা দেওয়া। কথায় কথায় বিতর্ক না করা, নিজেকে বড় না ভাবা, বড়াই প্রকাশ না করা, তার দুঃখে দুঃখী হওয়া, তার সহিত সদ্ব্যবহার করা, সর্বদা হিতসাধনের চেষ্টা করা, তার সপক্ষে (ন্যায্যতার সাথে) সহায়তা ও প্রতিরক্ষা করা, ইল্ম ও উপহার দিয়ে সাহায্য করা, কোন দোষ দেখলে গোপনে উপদেশ দেওয়া, তার জন্য দুআ করা, প্রেম ও বন্ধুত্বকে চিরন্তন করা, বন্ধুত্বে স্বার্থ না রাখা, তার বন্ধুত্বে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য রাখা, কোন কঠিন কাজের ভার বা দায়িত্ব না দেওয়া ইত্যাদি।

সেই বন্ধু উত্তম, যে কাছে এলেও যেমন একাকী থাকা যায় ঠিক তেমনিই তার সামনেও থাকা যায়। যার উপস্থিতিতে কোন কুণ্ঠা ও শঙ্কা নেই। অলসের বন্ধুত্ব গ্রহণ করলে নিজেকে অলস করার ভয় থাকে, তাই তার থেকে দূরে থাকাই উত্তম।

বন্ধুর মধ্যে যে সবগুণই বর্তমান থাকবে তা অসম্ভব। তবুও যার অমঙ্গলের চেয়ে মঙ্গলের পরিমাণ অধিক বেশী সেই বন্ধু হলেও যথেষ্ট।

নবী ﷺ বলেন, "অসৎ সঙ্গীর দৃষ্টান্ত, যেমন এক কামার; যার নিকট বসলে দুর্গন্ধ ও ধুঁয়া লাগে এবং আগুনের ফিন্‌কি দ্বারা কাপড় পুড়ে থাকে। আর সৎ সঙ্গীর দৃষ্টান্ত, যেমন কোন আতরওয়ালা; যার নিকট বসলে সুগন্ধ পাওয়া যায়। সে আতর উপহার দেয় অথবা তা ক্রয় করা যায়।" *(আবূ দাঊদ)*

তিনি আরো বলেন, "মুমিন ছাড়া আর কারো সাথী হয়ো না। আর তোমার খাদ্য যেন পরহেযগার ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ না খায়।" *(আবূ দাঊদ)*

আর মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ ﴾

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হও। *(সূরা তাওবাহ ১১৯)*

ইল্‌ম নির্বাচন

নিয়ত শুদ্ধ করার পর তালেবে ইলমের উচিত, অধিক প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে তলব আরম্ভ করা; শরীয়তের ইল্‌ম, আরবী ও তার সহায়ক ইল্‌ম শিক্ষা করা। শুরুতে আরবী আদবের উপর জোর দেওয়া। এই পদ্ধতির বিশদ বিবরণ ও পাঠ্য-নির্ঘন্ট বিদিত ও প্রচলিত; যা কাল-পাত্র ভেদে বিভিন্ন হয়ে থাকে। তবে এমন নিকটবর্তী পথে চলা উচিত, যে পথ যথার্থ ইলমী গন্তব্যস্থলে পৌছায়। এমন বই-পুস্তক নির্বাচিত করা এবং তার অধ্যয়নে অভিনিবিষ্ট হওয়া উচিত, যা বিষয়গত দিক থেকে সবচেয়ে উত্তম, স্পষ্টতর বোধগম্য এবং অধিক উপকারী।

তালেবে ইল্‌ম তা যথাসাধ্য হিফ্য করায় প্রয়াসী হবে অথবা বারংবার তা নিয়ে পুনরোনুশীলন করবে যাতে কিতাবের বিষয়বস্তু যথার্থভাবে উপলব্ধ ও স্মৃতিস্থ হয়ে যায়।

ইবনুল কাইয়্যেম (রঃ) বলেন, 'ইল্‌ম (শিক্ষা ও জ্ঞান) এর মর্যাদা মা'লুম (শিক্ষণীয় ও জ্ঞাতব্য) বিষয়বস্তুর মর্যাদার অনুসারী। যেহেতু তার যুক্তি-প্রমাণ ও দলীলের উপর আত্মা আস্থাবান হয়। তা জানার প্রয়োজন অতি বেশী হয় এবং তদ্দ্বারা সর্বাধিক লাভবানও হওয়া যায়। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সর্বশ্রেষ্ঠ, বৃহৎ ও মহান জ্ঞাতব্য-বিষয় হল আল্লাহ; যিনি ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই, যিনি বিশ্বজাহানের প্রতিপালক। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর নিয়ন্তা। যিনি রাজা, সত্য ও ব্যক্ত, সকল পূর্ণতাগুণে তিনি গুণান্বিত, প্রত্যেক ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা হতে তিনি পবিত্র, তাঁর পূর্ণতা-গুণে প্রত্যেক দৃষ্টান্ত ও সাদৃশ্য হতে তিনি নিরঞ্জন। আর এতেও কোন সন্দেহ নেই যে, তাঁর নামাবলী, গুণগ্রাম এবং কর্মসমূহের ইল্‌মই সকল ইলমের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও প্রকৃষ্ট ইল্‌ম। এই ইলমের তুলনায় অন্যান্য ইল্‌ম (অদ্বীনী শিক্ষা) এর মান যেমন এর জ্ঞাতব্য বিষয় (আল্লাহর) তুলনায় অন্যান্য জ্ঞাতব্য

বিষয়ের মান। যেমন তাঁর ইল্‌ম সমস্ত ইলমের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম। তেমনি এই ইল্‌ম অন্যান্য সকল ইলমের মূল। যেমন সারা সৃষ্টির অস্তিত্ব তাঁরই অস্তিত্বের মুখাপেক্ষী এবং তিনিই সকল বস্তুর প্রভু, প্রতিপালক, মালিক ও উদ্ভাবক।-----

সুতরাং এই ইল্‌মই বান্দার সৌভাগ্য, পূর্ণতা ও তার ইহ-পরকালের মঙ্গলের মৌলিক ইল্‌ম। যা না জানা তার আত্মা এবং তার কল্যাণ, পূর্ণতা, শুদ্ধি ও নিষ্কৃতির পথ না জানা; যা বান্দার দুর্ভাগ্যের মূল।

পক্ষান্তরে বান্দার পক্ষে তার সৃজনকর্তা ও স্রষ্টার প্রেম, তাঁর সর্বদা স্মরণ এবং তার সন্তুষ্টিলাভের নিরন্তর প্রচেষ্টা অপেক্ষা তার হৃদয় ও জীবনের জন্য অন্য কোন জিনিসই অধিক উত্তম, সুস্বাদু, ও সুললিত নেই।

বান্দার জন্য এটাই তো নৈপুণ্য ও পরিপূর্ণতা। যা ব্যতীত সে 'কামেল' হতেই পারে না। এর জন্যই তো সৃষ্টিজগৎ রচিত হয়েছে, আকাশ ও পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বেহেশ্ত ও দোযখ সৃষ্টি হয়েছে, রসূল ও আম্বিয়া প্রেরিত হয়েছেন, ওহী অবতীর্ণ হয়েছে, শরীয়তের বিধান প্রবর্তিত হয়েছে, কা'বা শরীফ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং আল্লাহর যিক্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মানুষের উপর ঐ গৃহের হজ্জ ফরয করা হয়েছে; যা তাঁর প্রেম ও সন্তুষ্টি বিধানেরই অঙ্গবিশেষ।

এ জন্যই তো জিহাদের আদেশ এসেছে, যে তা অস্বীকার করেছে এবং অন্য কিছুকে তার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছে তার শিরশ্ছেদ করা হয়েছে এবং পরকালে তার জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে চিরস্থায়ী লাঞ্ছনাময় বাসস্থান।

এই বৃহৎ বিষয়ের উপরেই দ্বীনের বুনিয়াদ রাখা হয়েছে ও কেবলা নির্ধারিত হয়েছে। যে বিষয় সৃষ্টিবৃত্তের কেন্দ্রবিন্দু এবং দ্বীন ও কেবলার প্রাণকেন্দ্র। আর ইলমের সিংহদ্বার ব্যতীত এর প্রতি দ্বিতীয় কোন প্রবেশপথ নেই। যেহেতু কোন বস্তুকে ভালোবাসা তাকে অনুভব করার পরবর্তী পর্যায়। যে ব্যক্তি সবার চেয়ে অধিক আল্লাহকে চেনে সেই ব্যক্তিই সর্বাধিক আল্লাহর প্রেমিক। কারণ, যে ব্যক্তি আল্লাহকে প্রকৃতভাবে জানবে ও চিনবে সে ব্যক্তি তাঁকে ভালোবাসবে। আর যে ব্যক্তি দুনিয়া ও দুনিয়াবাসীকে প্রকৃতভাবে চিনবে সে তাতে অনাসক্ত হবে। সুতরাং ইল্‌মই এই বৃহৎ দরজা উন্মুক্ত করে যা আল্লাহর সৃষ্টি ও নির্দেশের রহস্য।' *(মিফতাহু দা-রিস সাআদাহ ১/৮৬, আদাবু তালেবিল ইলম ১২৩-১২৬পৃঃ)*

সুতরাং তালেবে ইলমের উচিত যে, সে এমন ইল্‌ম নির্বাচন করবে যা ইহ-পরকালের জন্য তার অধিক প্রয়োজন ও উপকারী। সুতরাং আল্লাহ আযযা অজাল্ল

তাঁর নাম ও গুণাবলী এবং কর্মাবলীর ইল্‌ম সর্বাগ্রে অর্জন করবে। তা আয়ত্ত হলে এই উম্মাহর অগ্রগণ্য সলফের সমঝে কিতাব ও সুন্নাহর ইল্‌ম অর্জন করতে মনোযোগী হবে। যাতে রসূল ﷺ কর্তৃক প্রদত্ত ও বর্ণিত শিক্ষা গ্রহণ তার জন্য বিশুদ্ধ, সঠিক ও সহজ হয়ে যাবে।

ইবনুল কাইয়্যেম (রঃ) আরো বলেন, 'রসূল ﷺ হতে ইল্‌ম গ্রহণ করা দুই প্রকার; কোন মাধ্যমের সাহায্য না নিয়ে সরাসরি গ্রহণ এবং মাধ্যমের সাহায্যে গ্রহণ। সরাসরি ইল্‌ম গ্রহণ তো তাঁদের ভাগ্যে ছিল যাঁরা প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছেন এবং অভীষ্ট বস্তু অর্জন করেছেন। পরবর্তীকালে উম্মতের কারো আর সে আশা নেই। কিন্তু সর্বোচ্চ স্থানের অধিকারী সেই ব্যক্তি, যে তাঁদের সরল পথের অনুসারী, তাঁদের নিখুঁত নীতির অনুবর্তী। আর সেই ব্যক্তি পশ্চাদ্‌গামী যে তাঁদের পথ হতে ডানে-বামে সরে যায়। এই ব্যক্তিই পথচ্যুত এবং ধ্বংস ও ভ্রষ্টতার মরুভূমিতে নিরুদ্দেশ।

কোন্ এমন গুণ বা উত্তম কর্ম আছে যার গুণাধার বা কর্তা তাঁরা ছিলেন না? এমন কোন্ কল্যাণ ও সত্যের পরিকল্পনা আছে যার তাঁরা অধিকারী ছিলেন না? আল্লাহর শপথ! তাঁরা সঞ্জীবনী নির্ঝর হতে সুমিষ্ট ও নির্মল পানি সরাসরি পান করেছেন। ইসলামের ভিত্তিসমূহকে এমন সুদৃঢ় করে গেছেন যাতে আর কারোর জন্য কোন দ্বিরুক্তির সুযোগ নেই। কুরআন ও ঈমান দ্বারা ইনসাফ করে মানুষের চিত্তজয় করে গেছেন। তরবারি ও বর্শা দ্বারা জিহাদ করে বহু দেশ জয় করে গেছেন। অতঃপর তাঁরা তাঁদের তাবেঈন (অনুসারীবর্গ) পর্যন্ত (সেই ইল্‌ম ও আমানত) বিশুদ্ধ ও নির্মল অবস্থায় (আমানতের সাথে) পৌঁছে দিয়েছেন; যা তাঁরা নবুয়তের আলোকবর্তিকার তাক হতে গ্রহণ করেছিলেন। যাতে তাঁদের সনদ (বর্ণনাসূত্র) ছিল, নবী ﷺ হতে, তিনি জিবরীল (আঃ) হতে এবং তিনি রব্বুল আলামীন হতে; যা বিশুদ্ধ সুউচ্চ সনদ ছিল। তাঁরা বিদায়ের পূর্বে বলে যান, 'এটা আমাদের প্রতি নবী ﷺ এর প্রতিশ্রুতি যদ্দ্বারা তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করলাম। আর এটা আমাদের প্রতিপালকের অসিয়ত ও অধ্যাদেশ এবং আমাদের উপর তাঁর ফরয (অবশ্যকর্তব্য); যা তোমাদের জন্যও অধ্যাদেশ ও ফরয।'

সুতরাং একনিষ্ঠ অনুসারী (তাবেঈন)গণ তাঁদের সুদৃঢ় নিখুঁত নীতির উপর পরিচালিত হলেন। সরল পথের উপর তাঁদের পদাঙ্কানুসরণ করলেন। অতঃপর তাঁদের অনুবর্তী (তাবে-তাবেঈন)গণ এই সত্যপথেরই অনুগামী হলেন। সত্য কথা

এবং প্রশংসিত ন্যায্য পথের দিশা পেলেন। তাঁরা তাঁদের পূর্ববর্তীগণের তুলনায় সেইরূপই ছিলেন যেরূপ অনুপম সত্যবাদী ঘোষণা করেছেন, "এদের বৃহৎ দলটি হবে অগ্রগামীদের মধ্য হতে; আর এদের কিছু লোক পশ্চাদ্‌গামীদের মধ্যেও থাকবে।" *(সূরা ওয়াকিয়াহ ১৩-১৪আয়াত)*

অতঃপর চতুর্থ শতাব্দীর ইমামগণের আবির্ভাব হল। যে শতাব্দীও এক বর্ণনামতে শ্রেষ্ঠ শতাব্দী; যেমন আবুসাঈদ, ইবনে মসউদ, আবু হুরাইরা, আয়েশা এবং ইমরান বিন হুসাইন (রাঃ) এর হাদীস হতে শুদ্ধ প্রমাণিত। তাঁরাও তাঁদের পূর্ববর্তীগণের পদরেখা দেখে উক্ত পথেই পরিচালিত হলেন। তাঁদের জ্ঞানালোকের তাক হতে সেই জ্ঞান আহরণ করলেন। যাঁদের অন্তর ও বক্ষ আল্লাহর দ্বীনের উপর কারো রায়, অন্ধানুকরণ অথবা কিয়াসকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হতে বহু উর্দ্ধে। যার ফলে তাদের সুপ্রশংসার পতাকা বিশ্বজাহানে উড্ডীন হয়েছে। আর আল্লাহ পাক তাঁদের জিহ্বায় সত্যবাদিতা দান করেছিলেন।

অতঃপর তাঁদের পদাঙ্কানুসরণ করে তাঁদের অনুগামীদের অগগ্রামী দল পরিচালিত হলেন। তাঁদের দলভুক্ত ও অনুপ্রাণিত ব্যক্তিবর্গ তাঁদেরই নীতির উপর চলমান হলেন। কোনও ব্যক্তি বিশেষের অন্যায় পক্ষপাতিত্ব হতে দূরে থেকে, দলীল ও প্রমাণের সহিত থেমে, হক ও ন্যায়ের সাথে চলতেন; যেদিকে তার বাহন চলত। সঠিকের সাথে কুচ করতেন; যেখানে তার শিবির কুচ করত। দলীল যখন তার যাদুক্রিয়ার সহিত তাঁদের নিকট স্পষ্ট হত তখন তাঁরা একাকী ও দলেদলে সেদিকেই উড়ে যেতেন। রসূল ﷺ (শুদ্ধ হাদীস) যখন তাঁদেরকে কোন বিষয়ের প্রতি আহ্বান করতেন তখন বিনা কোন কৈফিয়তে তাঁরা তাঁর আহ্বানে সাড়া দিতেন। তাঁদের হৃদয় ও বক্ষে (কিতাব ও সুন্নাহর) স্পষ্ট উক্তি এত মহান ও সম্মানিত ছিল যে, তার উপর তাঁরা আর কারো কথাকে প্রাধান্য দিতেন না, অথবা আর কারো রায় বা কিয়াসকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করতেন না।' *(ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন ১/৫)*

মোটকথা তালেবে ইলমের উচিত, কুরআন ও সুন্নাহর ইল্‌মসমূহের প্রতি তার সকল সামর্থ্য, মনোযোগ ও হিম্মতকে ব্যয় করা। যেহেতু এই দুয়ের ইল্‌মই প্রকৃত ও সত্য ইল্‌ম এবং উভয় ব্যতীত অন্য কিছুকে না জানা এমন মূর্খতা যাতে কোন (পারলৌকিক) ক্ষতি নেই।

ইলমের খনি ও তার প্রধান হল, আল্লাহ আয্‌যা অজাল্লার কিতাব এবং দ্বিতীয় ওহী রসূল ﷺ এর সুন্নাহ। সুতরাং এই দুয়ের উপর যত্নবান হওয়া তালেবে ইলমের

একান্ত কর্তব্য। এই দু'টিই তো নিরাপদ মরূদ্যান, সুখময় আশ্রয়স্থল, সঘন ছায়াতরু এবং সুন্দর সাফল্য।

ইমাম শাফেয়ী বলেন, 'ইল্ম তো দুটিই; দ্বীনি ইল্ম যা ফিক্হ এবং পার্থিব ইলম যা মেডিসিন (ডাক্তারী)। এ ছাড়া কাব্য ইত্যাদি ইলমে কেবল পরিশ্রম থাকে এবং তা অনর্থক।' *(হুলয়্যাতুল আওলিয়া ৯/১৪২)*

যেমন তার কর্তব্য এই দুয়ের পূর্ণজ্ঞান লাভ করতে আনুষঙ্গিক ও সহায়ক অন্যান্য ইল্ম শিক্ষা করা।

আসমায়ী বলেন, 'যে তালেবে ইল্ম ঠিকমত নহু (আরবী ব্যাকরণ) না শিখে, তার উপর আমার সবচেয়ে বড় আশঙ্কা হয় যে, (হাদীস পড়ার সময়) আল্লাহর নবী ﷺ এর এই কথায় সে শামিল হয়ে যাবে, "যে ব্যক্তি আমার উপর মিথ্যা বলে সে নিজের ঠিকানা ও বাসস্থান জাহান্নামে বানিয়ে নেয়।" *(সিয়ারু আ'লামিন নুবালা' ৯/১৭৮)*

আব্বাস বিন মুগীরাহ বলেন, আব্দুল আযীয দারাঅর্দী কিছু লোকসহ আমার পিতার নিকট এলেন একটি কিতাব পড়ে শুনাতে। দারাঅর্দী তাদের সকলের জন্য পড়তে লাগলেন। কিন্তু তাঁর ভাষা খুব অশুদ্ধ ছিল। পড়তে পড়তে মারাত্মক-মারাত্মক ভুল পড়ছিলেন তিনি। তখন আমার পিতা তাঁকে বললেন, 'খুব হয়েছে দারাঅর্দী! এসবে (ইলমে) ধ্যান দেওয়ার পূর্বে তোমার জন্য অধিক প্রয়োজন ছিল নিজ ভাষা শুদ্ধ করা।' *(ঐ ৮/৩৬৮)*

তদনুরূপ তালেবে ইল্মের উচিত, তার মাতৃভাষাতেও দক্ষতা লাভ করা। নচেৎ অমার্জিত ও অশুদ্ধ ভাষায় দাওয়াতি কাজ প্রতিহত হতে পারে। মানতেক ফালসাফায় অধিক মনোযোগ না দিয়ে যুগোপযোগী সাধারণ জ্ঞান (বিজ্ঞান, ভুগোল, ইংরাজী, অংক প্রভৃতি) শিক্ষার প্রবণতা রাখবে। সর্ব বিষয়ে পারদর্শিতা যদিও সম্ভব নয় তবুও আসল (কিতাব ও সুন্নাহর) ইল্ম যথাযথভাবে শিক্ষা করে সাধারণ জ্ঞান কিছু কিছু করে শিখতে পারলে দাওয়াতে অবশ্যই সফলতা লাভ করতে সক্ষম হবে। যেমন বিদেশী ভাষা শিখলে বিদেশে দাওয়াত-কর্মে অংশ গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করবে।

ওস্তায নির্বাচন

অনুরূপভাবে তালেবে ইলমের কর্তব্য, তার উপযুক্ত শিক্ষক ও ওস্তায নির্বাচনে ভাবনা-চিন্তা করা। অতএব সেই ওস্তাযের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করবে যিনি হবেন অধিক জ্ঞানী, অভিজ্ঞ, পরহেযগার এবং বয়স্ক। যেমন আবু হানীফা (রঃ) চিন্তা-ভাবনা করার পর হাম্মাদ বিন সুলাইমানকে ওস্তাযরূপে গ্রহণ করেছিলেন। যাঁর প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, 'আমি তাঁকে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, ধৈর্যশীল ও সহ্যশীল শায়খরূপে পেয়েছিলাম। তাঁর নিকট দৃঢ়ভাবে স্থায়ী ছিলাম তাই আমি উদ্‌গত হয়েছি।' *(তা'লীমুল মুতাআল্লিম ১২পৃঃ)*

ইবনে জামাআহ বলেন, 'তালেবে ইল্‌মকে সর্বাগ্রে ভাবনা-চিন্তা করে এবং আল্লাহর নিকট ইস্তেখারা করে দেখা উচিত যে, সে কার নিকট হতে ইল্‌ম গ্রহণ করবে এবং সদাচরণ, আদব ও শিষ্টতা কার নিকট হতে শিক্ষা করবে। যদি সম্ভব হয় তাহলে তাকে এমন ওস্তায গ্রহণ করা উচিত, যাঁর যোগ্যতা পরিপূর্ণ হয়েছে, স্নেহ-বাৎসল্য বাস্তবায়িত হয়েছে, শালীনতা অভিব্যক্ত হয়েছে, নৈতিক পবিত্রতা সুপরিচিত হয়েছে এবং সংযমশীলতা প্রসিদ্ধ হয়েছে। যিনি শিক্ষাদানে উত্তম শিক্ষক ও পাঠ্যবিষয় বুঝতে সুদক্ষ। তালেবে ইল্‌ম তাঁর নিকট তার ইল্‌ম বৃদ্ধির আশা ও আগ্রহ যেন না রাখে যাঁর দ্বীন, সংযমশীলতা, পরহেযগারী এবং সচ্চরিত্রতায় কমি রয়েছে।'

ইবনে সীরীন বলেন, 'এই ইল্‌ম তো দ্বীন। অতএব তোমরা কার নিকট হতে তোমাদের দ্বীন গ্রহণ করছ তা লক্ষ্য করো।' *(মুসলিম, মুকাদ্দামাহ)*

কেবল প্রসিদ্ধ ওলামাদের নিকট হতেই শিক্ষা গ্রহণ সীমাবদ্ধ হওয়া এবং অপ্রসিদ্ধ যোগ্য ওলামাদের নিকট শিক্ষা ত্যাগ করা হতে সাবধান হওয়া উচিত। যেহেতু গাযালী প্রভৃতি ওলামাগণ এরূপ করাকে ইলমে অহংকার প্রকাশ করার মধ্যে গণ্য করছেন এবং তা একপ্রকার আহাম্মকী বলে আখ্যায়ন করেছেন। কারণ, হিকমত ও জ্ঞান মুমিনের হারিয়ে যাওয়া বস্তু, যেখানেই পায় সেখান হতেই সে তা কুড়িয়ে নেয়। যেখানেই তা লাভ করার সুযোগ পায় সেখানেই গনীমত জেনে সুযোগের সদ্ব্যবহার করে। যেই তার অনুগ্রহ করতে চায় তারই নিকট হতে তা সাদরে গ্রহণ করে। যেহেতু সে তো মূর্খতা থেকে পলায়ন করতে চায়; যেমন বাঘ হতে পলায়ন করা হয়। আর বাঘের কবল হতে যে মুক্তির পথ দেখায় পলায়নকারী তাকে হেয় ও তুচ্ছজ্ঞান করে না; তাতে সে যেই হোক না কেন।

সুতরাং এই অপ্রসিদ্ধ আলেমের নিকট যদি বর্কতের (তাকওয়া ও ইলমে প্রাচুর্যের) আশা থাকে তাহলে তাঁর দ্বারা উপকার ব্যাপক হয়। তাঁর তরফ থেকে প্রশিক্ষণ পরিপক্ক হয়। আর যদি পুর্বগামী ও পরগামী ওলামাদের অবস্থা সমীক্ষা করে দেখা যায় তাহলে দেখা যাবে যে, অধিকাংশ উপকৃত তিনিই হয়েছেন এবং সফলতা তিনিই লাভ করেছেন যাঁর শায়খ বা ওস্তায খুব পরহেযগার ছিলেন এবং তাঁর ছাত্রদের জন্য তাঁর বাৎসল্য ও হিতাকাংখায় তিনি উজ্জ্বল আদর্শ ছিলেন। অনুরূপভাবে যদি লিখিত বই-পুস্তকের উপর সমীক্ষা চালানো যায় তাহলে দেখা যাবে যে অধিক মুত্তাকী ও বিষয়-বিরাগী আলেমের লিখিত গ্রন্থই অধিক উপকারী এবং সেই গ্রন্থ অধ্যয়নেই অধিক সাফল্য বর্তমান।

তালেবে ইলমের আরো চেষ্টা করা উচিত, যাতে তার ওস্তায শরীয়তের ইল্মে পরিপূর্ণ অবহিত হন। সমসাময়িক অন্যান্য আস্থাভাজন ওলামাদের সহিত যেন তাঁর অধিকাধিক যোগাযোগ, ইল্মী-আলোচনা এবং দীর্ঘ বৈঠক হয়। তিনি যেন সরাসরি কিতাব থেকে গৃহীত ইলমের আলেম না হন; যিনি সুদক্ষ ওলামাদের সাহচর্যে সুপরিচিত নন।

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কিতাব সমূহের উদর হতেই ফিক্হ গ্রহণ করবে সে আহকাম বিনষ্ট করে ফেলবে।' আর অনেকে বলেছেন যে, 'কিতাব বা কাগজকে ওস্তায করা খুব বড় আপদ। অর্থাৎ যারা কেবল কিতাব থেকেই ইল্ম শিখতে চায় তারা ওলামাদের বালাই।' *(তাযকিরাতুস সামে' ৮৫পৃঃ)*

ইব্রাহীম বলেন, 'ওঁরা যখন কারো নিকট ইল্ম গ্রহণ করতে আসতেন তখন তাঁর বেশভূষা, নামায এবং অন্যান্য অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করতেন। অতঃপর তাঁর নিকট ইলম গ্রহণ করতেন।'

সওরী বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন বিদআতীর নিকট কিছু শোনে আল্লাহ সেই শোনাতে তাকে উপকৃত করবেন না। আর যে ব্যক্তি তার সহিত মুসাফাহা করল সে ইসলামকে ধ্বংস করল।'

মালেক বিন আনাস বলেন, 'চার ব্যক্তি হতে ইলম গ্রহণ করা হবে না; বাকী অন্যান্য হতে গ্রহণ করা হবে; নির্বুদ্ধিতা প্রকাশকারী নির্বোধের নিকট হতে ইলম গ্রহণ করোনা; যদিও সে সবচেয়ে অধিক বর্ণনাকারী হয়। মিথ্যুকের নিকট থেকে ইলম গ্রহণ করো না; যে মানুষের সহিত ব্যবহারে কথাবার্তায় মিথ্যা বলে থাকে -যখন তাকে পরীক্ষা করে দেখা যাবে যে সে সত্যই মিথ্যা বলে; যদিও সে রসূল ﷺ এর

উপর মিথ্যা বলায় অভিযুক্ত নয়। কোন প্রবৃত্তি পূজারীর নিকটেও ইলম গ্রহণ করো না; যে মানুষকে তার প্রবৃত্তি (বিদআত) এর প্রতি আহ্বান করে। আর সেই শায়খ হতে ইল্ম গ্রহণ করো না যার অবদান ও ইবাদত আছে, কিন্তু কি বয়ান করে তা সে নিজেই জানে না। *(আল-জামে' লিআখলাকির রাবী ১/ ১৩৯)*

শত সাবধান সেই আলেম, মুদার্রিস ও ওস্তায হতে যার হৃদয় মরিচায় কালো হয়ে আছে। ফলে তার চিন্তাশক্তি, বোধ ও উপলব্ধি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। যার কারণে সে হক ও ন্যায় গ্রহণ করে না এবং বাতিল ও অন্যায়ের প্রতিবাদ ও প্রতিকার করে না। যার মূলে রয়েছে ঔদাস্য ও প্রবৃত্তি পূজা; যা অন্তর্জ্যোতিকে নিষ্প্রভ করে এবং তার হৃদয়ের দৃষ্টি-শক্তিকে অন্ধ করে দেয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন, "তুমি নিজেকে ওদেরই সংসর্গে রাখবে যারা সকাল ও সন্ধায় নিজেদের প্রতিপালককে তাঁর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে আহ্বান করে এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে ওদের থেকে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিও না। আর যার চিত্তকে আমি আমার স্মরণে উদাসীন করে দিয়েছি, যে তার খেয়ালখুশীর অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে তুমি তার আনুগত্য করো না।" *(সূরা কাহফ ২৮ আয়াত)*

সুতরাং কোন তালেবে ইল্ম বা কোনও সাধারণ ব্যক্তি যখন কারো অনুসরণ করতে চাইবে তখন তাকে লক্ষ্য করা উচিত যে, সে অনুসরণীয় ব্যক্তি আল্লাহকে স্মরণকারী অথবা তাঁর স্মরণে উদাসীনদের মধ্যে গণ্য? তার জীবনে প্রবৃত্তি ও খেয়ালখুশীর আধিপত্য বর্তমান অথবা ওহীর? যদি তার জীবনে খেয়ালখুশী ও মানসতাই আধিপত্য বিস্তার করে থাকে এবং সে উদাসীন হয় তবে তার কর্ম সীমালঙ্ঘিত ও বিনষ্ট। যে এমন গুণের গুণী তার অনুসরণ ও আনুগত্য করতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন। অতএব ওস্তায যদি এরূপই হয়ে থাকেন তবে তাঁর থেকে দূরে সরে যাওয়া উচিত এবং তাঁকে নিজের অনুসরণীয় ব্যক্তিরূপে প্রতিষ্ঠা ও স্থিরীকৃত না করাই কর্তব্য। পক্ষান্তরে যদি তাঁকে আল্লাহর স্মরণ, সুন্নাহর অনুসরণ এবং সৎকর্মে জাগ্রত, তৎপর ও সীমাবদ্ধ পায়, আর তাঁর কর্তব্যে দূরদর্শী ও পারদর্শী পায় তাহলে তাঁরই পিছু ধরা উচিত। যেহেতু মৃত ও জীবিতের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করে আল্লাহর যিক্র। যে আল্লাহকে স্মরণ করে সে জীবিত এবং যে করে না সে মৃত। আর মৃতের নিকট কি কিছু শিখা যায়? *(আল ওয়াবিলুস স্বইয়্যেব ৩৭ পৃঃ)*

নিষ্ঠা ও শিষ্টাচারিতা

যে ব্যক্তি যা কিছু পাঠ বা শ্রবণ করে সেই তদ্দ্বারা উপকৃত হতে পারে এমনটা নয়। যেহেতু পড়া ও শোনার সাথে মনের যোগ না হলে তা নিরর্থক হয়।

ইবনুল কাইয়্যেম (রঃ) বলেন, 'কুরআন দ্বারা যদি উপকৃত হতে চাও তবে তেলাঅতের সময় তোমার হৃদয়কে উপস্থিত কর, শ্রবণকালে উৎকর্ণ থাক এবং মনে মনে সেই পরিবেশে হাজীর হও যে পরিবেশের মানুষকে আল্লাহ তাআলা ঐ আয়াত দ্বারা সম্বোধন করেছেন। যেহেতু তা তাঁর দূত মারফৎ তোমার জন্যও সম্বোধন। আল্লাহ পাক বলেন,

﴿إِنَّ فِيْ ذلِكَ لَذِكْرى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْدٌ﴾

অর্থাৎ, "নিশ্চয় এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্য যার হৃদয় আছে অথবা নিবিষ্টচিত্তে উৎকর্ণ হয়ে শ্রবণ করে। *(সূরা ক্বাফ ৩৭ আয়াত)*

যেহেতু পরিপূর্ণ প্রভাব -প্রভাবশালী উপযোগী কথা, গ্রহণকারী স্থান বা পাত্র, প্রভাব লাভ করার শর্ত এবং তার কোন বাধা না থাকার অন্যসাপেক্ষ। উক্ত আয়াত এই সবকিছুকে সংক্ষিপ্ত শব্দে বর্ণনা করেছে।

'নিশ্চয় এতে উপদেশ রয়েছে' এই বাণী দ্বারা সূরার প্রথম থেকে এই আয়াত পর্যন্ত সমস্ত কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং এটাই হল প্রভাবশালী উপযোগী কথা। 'যার হৃদয় আছে' এ কথায় ইঙ্গিত রয়েছে গ্রহণকারী পাত্রের প্রতি, উদ্দেশ্য জীবিত হৃদয়; যা আল্লাহর বাণী বুঝতে সক্ষম। যেমন তিনি বলেন, "এতো কেবল এক উপদেশ এবং সুস্পষ্ট কুরআন; যার দ্বারা (মুহাম্মদ জাগ্রত-চিত্ত) জীবিত ব্যক্তিদেরকে সতর্ক করতে পারে।" *(সূরা ইয়াসীন ৬৯-৭০ আয়াত)*

'উৎকর্ণ হয়ে শ্রবণ করে' অর্থাৎ তার কর্ণকে খাড়া করে এবং শ্রবণেন্দ্রিয়কে তাকে যা বলা হচ্ছে তার প্রতি সংযোগ করে। আর এটা হচ্ছে প্রভাব লাভের শর্ত। 'নিবিষ্টচিত্তে' বা 'উপস্থিত হয়ে' অর্থাৎ নিজের মন ও হৃদয়কে তাতে হাজির করে, অন্যস্থানে ফেলে না রেখে বা উদাসীন না হয়ে শ্রবণ করা। আর এর দ্বারা প্রভাবলাভের প্রতিবন্ধী বিষয়সমূহের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে; আর তা হল, হৃদয়ের ঔদাস্য, যা বলা হচ্ছে তার জন্য মনের অনুপস্থিতি এবং প্রণিধানে অমনোযোগিতা।

সুতরাং যখন প্রভাবকারী -আর তা হল কুরআন- ও গ্রহণকারী পাত্র -আর তা হল জাগ্রতচিত্ত- একত্রে সমবেত হয় এবং সর্বশর্ত পূরণ হয় -আর তা হল উৎকর্ণতা,

অতঃপর প্রতিবন্ধক থেকে খালি হয় আর -তা হল মনের অনবধানতা, অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা হতে ঔদাস্য বা অন্য কোন বিষয়ে মনোযোগী হওয়া -তাহলেই প্রভাব অর্জন হয়; অর্থাৎ কুরআন ও উপদেশ দ্বারা উপকৃত হতে পারা যায়।' *(আল-ফাওয়াইদ ৫পৃঃ)*

ইল্‌ম সেই বস্তু যাতে মনোযোগী, নিষ্ঠাবান ও জাগ্রতচিত্ত না হলে লাভ করা যায় না। কবি বলেন,

'বই পড়ে কিন্তু যে নাহি দেয় মন,
কেমনে সে জন বল পাবে জ্ঞান ধন?
প্রদীপে না দিয়ে তেল বাতি যদি জ্বালো,
কখনো কি সে প্রদীপ দিয়ে থাকে আলো?'

আর কথায় বলে, 'কলম কালি মন, লিখে তিনজন।'

শিক্ষকের প্রতি সমীহ

অনুরূপভাবে ইলমের আরো এক নীতি, ওস্তায ও শিক্ষকের প্রতি বিনয়, শিষ্টতা ও সমীহ প্রদর্শন। যা না হলে শিক্ষক ও ছাত্রের সংযোগ থাকে না। দেওয়া-নেওয়ার ঐকান্তিক আগ্রহ থাকে না। ফলে উভয়ের কর্তব্য পালন তো হয়; কিন্তু ফললাভ হয় না। তাই তালেবে ইলমের উচিত, নিজ ওস্তাযের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা। বিনয়ের সাথে তাঁর সেবা করা।

শা'বী বলেন, 'একদা যায়দ বিন সাবেত এক জানাযার নামায পড়লেন। অতঃপর তাঁর প্রতি একটি অশ্বতরী পেশ করা হল; যাতে তিনি সওয়ার হন। তৎক্ষণাৎ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এসে সওয়ারীর পা-দানে ধরলেন। (যাতে তিনি সহজে চড়তে পারেন)। যায়দ তাঁকে বললেন, 'ছাড়ুন, হে রসূলুল্লাহ ﷺ এর পিতৃব্যপুত্র!' ইবনে আব্বাস বললেন, 'ওলামাদের সহিত এইরূপ ব্যবহারই করতে হয়।' *(ত্বাবারানী,বাইহাক্বী, হাকেম)*

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমাকে একটি হরফও শিখিয়েছে আমি তার গোলাম। সে ইচ্ছা করলে আমাকে বিক্রয় করতে পারে। নচেৎ ইচ্ছা করলে আমাকে গোলাম করে রাখতে পারে।'

সলফে সালেহীনগণ স্ব-স্ব ওস্তাযের বড় সম্মান করতেন। সমীহর সহিত শিক্ষকের প্রতি তাকাতে তাঁদের মনে ত্রাস সঞ্চার হত।

মুগীরাহ বলেন, 'যেমন আমীরকে ভয় করা হয় তেমনি আমরা (আমাদের ওস্তায) ইব্রাহীম নখয়ীকে ভয় করতাম।'

আইয়ুব বলেন, 'তালেবে ইল্ম হাসানের নিকট তিন বছর ধরে (দর্সে) বসত কিন্তু তাঁর ত্রাসে কোন বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করতে সাহস করত না।'

ইসহাক বলেন, 'আমি ইয়াহয়্যা কাত্তানকে আসরের নামায পড়ে মসজিদের মিনার গোড়ায় হেলান দিতে দেখতাম। তাঁর সম্মুখে আলী বিন মাদানী, শাযাকূনী, আম্র বিন আলী, আহমদ বিন হাম্বাল, ইয়াহয়্যা বিন মাঈন প্রভৃতি খাড়া হয়ে তাঁকে হাদীস বিষয়ে প্রশ্ন করতেন। তাঁরা একই অবস্থায় মাগরেবের নামায নিকটবর্তী হওয়া পর্যন্ত পায়ের উপর ভর করে দণ্ডায়মান থাকতেন। তবুও তিনি (কাত্তান) তাঁদের কাউকেও বলতেন না যে, 'বস।' আর তাঁরাও তাঁর ত্রাস ও সমীহতে বসতে সাহস করতেন না!'

ইবনুল খাইয়াত মালেক বিন আনাসের প্রশংসায় বলেন, 'তিনি কোন বিষয়ে উত্তর না দিলে তাঁর ত্রাসে দ্বিতীয়বার আর কেউ তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করত না। সমস্ত জিজ্ঞাসুরা চিবুক নত করে থাকত। তাঁর উপর উদ্ভাসিত হত প্রবল ব্যক্তিত্বের প্রভা এবং পরহেযগারীর মাহাত্ম্য। তিনি ভয়াবহ ছিলেন অথচ তিনি কোন শাসক ছিলেন না।'

আহমদ বিন হাম্বল খালাফ আহমারকে বলেছিলেন, 'আমি আপনার সম্মুখে ছাড়া বসিনা, আমরা আমাদের শিক্ষকের নিকট বিনয়ী হতে আদিষ্ট হয়েছি।'

সুতরাং তালেবে ইলমের উচিত, তার সকল বিষয়ে ওস্তাযের কথা মানা। তাঁর অভিমত ও তদবীরের বাইরে কোন কাজ না করা। সদা তাঁর সহিত দক্ষ চিকিৎসকের পার্শ্বে এক রোগীর মত অবস্থান করবে। যা করতে ইচ্ছা করবে সে বিষয়ে তাঁর পরামর্শ নেবে। অন্যান্য সকল কর্মে তাঁর সম্মতি অবশ্যই নেবে। তাঁর প্রতি গভীর সমীহ রাখবে। তাঁর সেবার মাধ্যমে আল্লাহর সামীপ্য আশা করবে। আর

একথা জানবে যে, ওস্তাযের খাতিরে লাঞ্ছনা পাওয়া মর্যাদা, তাঁর জন্য বিনয়াবনত হওয়া গর্ব এবং তাঁর নিকট নিচু হওয়া উন্নতির কারণ।

তালেবে ইলমের কর্তব্য, তার ওস্তাযের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা-দৃষ্টিতে তাকানো। সকল বিষয়ে তাঁর বিরক্তি ও বিরাগকে এড়িয়ে চলা। তাঁর সকল অবস্থা ও উপস্থিতিকে পরোয়া করে চলা। সলফরা এরূপই করতেন। তাঁদের অনেকে মনে মনে দুআ করতেন, 'আল্লাহ! তুমি আমার দৃষ্টি হতে আমার ওস্তাযের ত্রুটিকে গোপন কর। আর আমার নিকট হতে তাঁর ইলমের বর্কত তুমি ছিনিয়ে নিওনা।' *(তাযকিরাতুস সামে' ৮৮পৃঃ)*

ইমাম শাফেঈ (রঃ) বলেন, 'আমি মালেক (রঃ) এর নিকট তাঁর ভয়ে ধীরে ধীরে নিঃশব্দে (বই বা খাতার) পাতা উল্টাতাম; যাতে তিনি উল্টানোর শব্দ না শুনতে পান।'

তালেব আমীরজাদা হলেও ওস্তাযের সামনে বিনতির সাথে বসবে। যেহেতু ইল্ম ও আলেমের সম্মান সকল পার্থিব বিষয়ের ঊর্ধ্বে। ওস্তাযকে সম্বোধনকালে 'আপনি, লেন-দেন' প্রভৃতি বলবে। নাম ধরে না ডেকে সম্মানসূচক উপাধি দ্বারা ডাকবে। তাঁর অনুপস্থিতকালেও তাঁর নাম নেবে না, নিলেও সম্মানপূর্ণ খেতাব জুড়ে নাম নেবে। তাঁর অবর্তমানেও 'উনি-তিনি, বলেন' ইত্যাদি ব্যবহার করবে। কোন প্রকার অসম্মানসূচক আখ্যায়নে তাঁর উল্লেখ করবে না; যেমন বহু জাহেল অবজ্ঞার সাথে দ্বীনের আলেমকে তুচ্ছজ্ঞান করে 'মোল্লাজী, মৈলিবি' ইত্যাদি বলে আখ্যায়ন করে থাকে। আর তা এই কারণে যে, 'তাঁদের দৌড় মসজিদ পর্যন্ত' (?) গীর্জা বা রকেট পর্যন্ত নয় তাই! সত্যিই তো! যে দেশের লোকেরা কাপড়ই পরে না সে দেশে ধোপার আর কি কদর থাকতে পারে?

তালেবে ইল্ম ওস্তাযের সমস্ত অধিকার ও হক আদায় করবে; তাঁর অনুগ্রহ ও অবদান বিস্মৃত হবে না। তাঁর শ্রদ্ধার সংরক্ষণ করবে, তাঁর গীবতের প্রতিবাদ করতে, তাঁর জন্য রাগান্বিত হবে; তা না পারলে সেই গীবতের মজলিস ত্যাগ করে অন্যত্রে গমন করবে। সর্বদা তাঁর জন্য দুআ করবে। তাঁর মৃত্যুর পরও তাঁর জন্য দুআ এবং তাঁর অসহায় পরিবারের যথাসম্ভব তত্ত্বাবধান করবে।

শিক্ষার ময়দানে তালেবে ইল্মের উচিত, ওস্তাযের ক্রোধ ও বিভিন্ন কোপজ দোষের সম্মুখে ধৈর্য ও সহ্যশীলতা অবলম্বন করা। প্রহার করলেও দর্সগাহ বা মাদ্রাসা ত্যাগ

করে পলায়ন না করা অথবা তাঁর বিরুদ্ধে অভিভাবক অথবা শাসকগোষ্ঠীর নিকট অভিযোগ না করা। করলে তা হবে বড় আহাম্মকী।

একদা আ'মাশ তাঁর এক ছাত্রের উপর ক্রোধান্বিত হলেন। অপর এক ছাত্র ঐ ছাত্রকে বলল, 'যদি উনি আমার প্রতি এমন ক্রোধ দেখান যেমন তোমাকে দেখিয়েছেন তাহলে আমি আর উনার নিকট ফিরব না।' আ'মাশ শুনলে তিনি বললেন, 'তাহলে সে তো আহম্মক। আমার অসদাচারণের কারণে সে তার লাভজনক জিনিস ছেড়ে চলে যাবে।'

সুফিয়ানকে বলা হল, 'কত লোক পৃথিবীর সারা দেশ হতে আপনার নিকট আসছে তাদের উপর আপনি ক্রোধান্বিত হন? সম্ভতঃ ওরা আপনাকে ত্যাগ করে চলে যাবে।' তিনি উত্তরে বললেন, 'তারা তোমার মতই আহাম্মক তাহলে; যদি তারা আমার অসদাচরণের কারণে তাদের উপকারী বস্তু ছেড়ে চলে যায়।' *(তাযকিরাতুস সামে' ৯০পৃঃ, আল জামে'২২৩পৃঃ)*

কিছু সলফ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি শিক্ষার লাঞ্ছনার উপর ধৈর্য ধারণ করে না সে তো সারা জীবন মূর্খতার অন্ধত্বে থাকে। আর যে ব্যক্তি সবর করে লিখা-পড়া করে দুনিয়া ও আখেরাতে তার সম্মানলাভ হয়।'

ইবনে আব্বাস বলেন, 'ছাত্র হয়ে লাঞ্ছনা সহ্য করেছি তাই আজ শিক্ষক হয়ে সম্মান লাভ করছি।'

শিক্ষকের উপর ক্রোধ প্রকাশ ছাত্রের জন্য সমীচীন নয়। যেহেতু শিক্ষক তাকে যে কড়া কথা বলেন অথবা প্রহার করেন তা তো তার মঙ্গলের জন্যই করেন, তাতে শিক্ষকের কোন স্বার্থ নেই। অনুরূপভাবে (দলীল ও যুক্তির ভিত্তিতে স্বমত ভিন্ন হলেও) শিক্ষকের সহিত তর্কাতর্কি করাও তার জন্য সঙ্গত নয়। যেহেতু এতে বহু অমঙ্গল আছে যা তার ইলমের আকাশে মেঘ ডেকে আনে। তাই মাইমুন বিন মিহরান বলেন, 'তোমার চেয়ে যে অধিক জ্ঞানী তার সহিত তর্ক করো না। যদি তা কর তবে সে তোমার উপর হতে তার ইল্ম রুখে নেবে এবং তার কোন নোকসান হবে না।'

যুহরী বলেন, 'সালামাহ ইবনে আব্বাসের সহিত তর্ক করত, যার ফলে বহু ইলম হতে সে বঞ্চিত ছিল।' *(জামেউ বায়ানিল ইলম ১৭১ পৃঃ)*

মোটকথা, তালেবে ইল্ম যদি তার সদাচরণ, নিষ্ঠা ও শিষ্টতা দ্বারা ওস্তাযকে সমীহ ও শ্রদ্ধা করে আনন্দিত করতে পারে তবে শিক্ষক তাঁর ইলমের পাত্র তার পাত্রে

ঢেলে দেবেন। নচেৎ মনের মধ্যে 'কিন্তু' সৃষ্টি করে দিলে তিনি তার জন্য হিতাকাঙ্খী না হয়ে কেবল দায়িত্ব পালনকারী হবেন।

তদনুরূপ মুদার্রেসের উপর অসম্মানজনক চাপ, কমিটি বা মাদ্রাসার কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে অহেতুক বা অমূলক টিপ্পনী বা ফোড়ন, তাঁদের সম্মানে আঘাত লাগে এমন কর্তৃত্ব ইত্যাদি প্রকৃত ইলমের স্বার্থে নয়। যাতে ছাত্রদের প্রকৃত উন্নতির কথা ভাবতে গেয়ে তাঁদের মন ভেঙ্গে হিতে বিপরীত হয়। সাপ মারতে গিয়ে লাঠি ভেঙ্গে বসে থাকে। যার কারণেই অনেক মাদ্রাসায় তালাও পড়ে যায়।

তালেব ইলমের উচিত, ওস্তাযকে কোন প্রকার বিরক্ত ও 'ডিস্টার্ব' না করা। নিদ্রিত থাকলে কোন অজরুরী কাজের জন্য বা কোন প্রশ্নের জন্য অথবা সবক বুঝে নেওয়ার জন্য জাগ্রত না করা, দরজা বন্ধ থাকলে অনুমতি না নিয়ে তাঁর রুমে প্রবেশ না করা, আদবের সহিত অতি ধীরে দরজায় ধাক্কা দেওয়া এবং অনুমতি দিলে সালাম দিয়ে প্রবেশ করা। ওস্তাযের সামনে বা ক্লাসে গেলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে এবং শরীরের দুর্গন্ধ দূর করে যাবে। যেহেতু তাঁর মজলিস ইলমের মজলিস, যিক্র ও ইবাদতের মজলিস।

তিনি কোন কাজে ব্যস্ত থাকলে নিজের কোন কাজের জন্য তাঁর নিকট যাবে না। সেখানে পৌঁছে তিনি যদি আসার কারণ জিজ্ঞাসা করেন অথবা অপেক্ষা করতে বলেন তাহলে অপেক্ষা করবে, নচেৎ সালাম দিয়ে সত্বর তাঁর নিকট হতে বের হয়ে যাবে। আর তিনি অনুমতি দিলেও বেশীক্ষণ তাঁর সময় নষ্ট করবে না।

ওস্তাযের নিকট বা ক্লাসে গেলে তার অন্তরকে সমস্ত ব্যস্ততা থেকে খালি করবে এবং মস্তিষ্ককে স্বচ্ছ করবে। তন্দ্রা, ক্রোধ অতি ক্ষুধা বা পিপাসা ইত্যাদির অবস্থায় যাবে না। যাতে তার হৃদয় প্রশস্ত হয় এবং যা বলা হয় তা আয়ত্ত করতে পারে।

সর্বদা চেষ্টা করবে যেন একটা ক্লাসও ছুটে না যায়। কারণ শিক্ষকের নিকট সে দর্স্ ছুটে যায় তার কোন বিকল্প ও বিনিময় নেই।

অসময়ে ওস্তাযের নিকট পড়া বুঝতে যাবে না। নিজের জন্য তাঁর নিকট হতে কোন নির্দিষ্ট সময় অথবা স্থান নির্ধারিত করতে চাইবে না; যদিও সে আমীরজাদা বা ধনীর ছেলে হয়। যেহেতু তাতে ওস্তায ও অন্যান্য ছাত্রদের উপর অহংকার ও আহাম্মকি প্রদর্শন হয়।

ক্লাসে পৌঁছে সকলের উদ্দেশ্যে সালাম দিবে, ব্যাখ্যা না চললে ওস্তাযকে বিশেষ অভিবাদন জানাবে। অতঃপর মজলিস যেখানে শেষ হয়েছে তার একপ্রান্তে নীরবে

বসে যাবে। ক্লাস চলাকালীন কাউকে ডিস্টার্ব অবশ্যই করবে না। একেবারে ওস্তাযের মুখোমুখি অথবা পাশাপাশি বেআদবের মত বসবে না। তাঁর সম্মুখে বিনয় ও শিষ্টতার সহিত বসবে, তাঁর প্রতি তাকিয়ে উৎকর্ণ হবে, নিজ দেহ-মন সবকিছু দ্বারা তাঁর প্রতি মুখ করে বসবে। তিনি যা বলছেন বা ব্যাখ্যা করছেন তা নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ করবে ও বুঝবে। এসময়ে এদিকে ওদিক দৃষ্টি ফিরাবে না। বিশেষ করে তাকে সম্বোধন করে কথা বললে অপ্রয়োজনে তাঁর নিকট হতে মুখ ফিরিয়ে নেবে না। পার্শ্বে বা বাইরে কোন শব্দ পেলেও ফিরে তাকাবে না। তাঁর সম্মুখে জামা-কাপড় বা চাদরাদি ঝাড়বে না। জামার হাতা গুটাবে না। হাত বা পায়ের আঙ্গুল, দাড়ি, নাক, দাঁত, কলম বা সিট ইত্যাদি নিয়ে খেলা করবে না। নাক বা দাঁতের ময়লা সাফ করবে না, ঘা থাকলে তা খুঁটবে না, হাই বা হাঁচির সময় মুখে রুমাল বা হাত রেখে নেবে। হাঁচির সময় খুব জোরে শব্দ না করার চেষ্টা করবে, হো-হো করে সশব্দে হাই তুলবে না।

তার সামনে কিছুতে হেলান দিয়ে অথবা পায়ের উপর পা চাপিয়ে অথবা তাঁর দিকে পা বাড়িয়ে অথবা তাঁর চেয়ে উঁচু জায়গায় বসবে না। অপ্রয়োজনে অধিক কথা বলবে না। বেআদবীপূর্ণ অশ্লীল বা হাস্যকর কোন কথা বা গল্প শুনাবে না। অকারণে হাসবে না। হাসলে মুচকি হাসবে। অপ্রয়োজনে অধিকাধিক গলা ঝাড়বে না। তাঁর সহিত হাত হিলিয়ে বা চোখ ঠেরে কথা বলবে না। তাঁর মজলিসের বিশেষ আদব করবে; যেমন সলফে সালেহীনরা করতেন। তাঁরা ইল্মী মজলিসে এমন একাগ্রতার সহিত বসতেন এবং এমন ধীর ও স্থির থাকতেন যেন তাঁদের মাথায় কোন পাখী বসে থাকত।

ওস্তাযের কোন কথার উপর প্রতিবাদ প্রয়োজন হলে সশ্রদ্ধ প্রতিবাদ আদবপূর্ণ শব্দে পেশ করবে। তিনি কোন কাহিনী, কবিতা বা তথ্য পেশ করলে এবং তা তার পূর্ব হতে জানা থাকলেও বিস্ময়ের সাথে উৎকর্ণ হয়ে শ্রবণ করবে। জ্ঞান-পিপাসা ও জানার আগ্রহ প্রকাশ করে তা শোনা মাত্র আনন্দিত হবে। এই ভাব প্রকাশ করবে যে, সে যেন তা কখনো শুনেনি; আজ সে নতুন শুনল।

তাঁর ব্যাখ্যাদানের পূর্বে কোন বিষয়ের ব্যাখ্যা, তাঁর উত্তর দেওয়ার পূর্বে কোন প্রশ্নের উত্তর দেবে না। অথবা সে তার ব্যাখ্যা বা উত্তর জানে তা ভাবে-ভঙ্গিতেও প্রকাশ করবে না। মজলিসে তাঁর কথা কাটবে না। তাঁর বক্তৃতা চলাকালীন অন্য কারো সহিত মুখে বা ইঙ্গিতে কথা বলবে না।

তাঁকে কোন জিনিস দেওয়ার সময় ছুঁড়ে দেবে না। আদবের সহিত ধরিয়ে বা রেখে দেবে। কোন প্রয়োজন না হলে ওস্তাযের সামনে বা পাশাপাশি চলবে না; বরং তাঁর পিছনে চলবে। তিনি পায়ে হেঁটে চললে তাঁর সহিত সওয়ার হয়ে চলবে না। পথে তাঁর সহিত সাক্ষাৎ হলে আগে আগে স্মিতমুখে সালাম করবে এবং তাঁর অবস্থা জিজ্ঞাসা করবে।

তিনি কোন বিষয়ে পরামর্শ না চাইলে তাঁকে পরামর্শ দিতে যাবে না। পরামর্শ চাইলে বিনয়ের সাথে উচিত পরামর্শ দেবে। অবশ্য কোন বিপদ হতে সতর্ক করতে কোন সময়ই ভুলবে না।

দর্স্ চলাকালীন কোন বিষয় বুঝতে না পারলে আদবের সহিত তাঁকে জিজ্ঞাসা করবে। জিজ্ঞাসা করতে কোন লজ্জা বা কুণ্ঠাবোধ করবে না। অথবা অহংকারের সাথে প্রশ্ন করা অপ্রয়োজন ভাববে না। আবার তাঁকে পেঁচে ফেলার জন্য অথবা পরীক্ষা করার জন্য অতিরিক্ত প্রশ্নাদি করবে না। কোন বিষয় বুঝতে না পারলে এবং ওস্তায তাকে বুঝতে পেরেছে কিনা তা জিজ্ঞাসা করলে স্পষ্ট 'না' বলতে কোন লজ্জা বা সংকোচ নেই। না বুঝে 'হুঁ-হুঁ' করে ভবিষ্যতের জন্য বোঝা বাড়ানো উচিত নয়। আবার বুঝেও না বুঝার ভান্ করে তাকে বিরক্ত করা বৈধ নয়। কথায় বলে, 'বুঝেও যে বুঝেনা তাকে বুঝাবে কে? আর না বুঝে যে হুঁ-হুঁ করে তাকে ভূতে ধরেছে।'

অজানা বিষয়ে প্রশ্ন করা কোন দোষের নয়। প্রশ্ন করলে যদি কেউ বোকা মনে করে করুক, তবুও প্রশ্ন ত্যাগ করা উচিত নয়। কারণ, প্রশ্ন করে যে কিছু জানতে চায় সে বোকা হয় মাত্র দু'-পাঁচ মিনিটের জন্য। কিন্তু জানার ভান করে যে কখনও প্রশ্ন করে না সে বোকা থাকে সারাটা জীবন।

কোন সবক বুঝতে বা তৈরী করতে কঠিন ও কষ্টবোধ হলেও নিরাশ হওয়া চলবে না। 'আরবী, পারবি তো পারবি, নচেৎ হেগে-মুতে ছাড়বি' কথায় ঘাবড়ে গেলে হবে না। একবারে না বুঝলে ওস্তাযের নিকট বারবার বুঝে নিয়ে, সহপাঠীদের সহিত বারংবার পুনরালোচনা ও অভ্যাস করে, একাধিকবার নিজে পড়ে মুখস্থ করে তবেই ক্ষান্ত হতে হবে। সবককে শুরু থেকেই কোনক্রমেই কঠিন মনে করা চলবে না। 'বুঝতে পারছি না' বলে হাত গুটিয়ে বসে গেলে হবে না। মনের মাঝে আনতে হবে অধ্যাবসায় ও সাধনার ঝড়।

কথিত আছে যে, জনৈক ছাত্র মাদ্রাসায় পড়তে গিয়ে সবক বুঝতে ও স্মৃতিস্থ করতে না পারলে নিরাশ হয়ে বাড়ি ফিরতে মনস্থ করে। ফেরার পথে পিপাসায় এক

কুয়োতলায় পানি পান করতে গিয়ে দেখে, একটি পাথর ক্ষয় হয়ে তাতে গর্ত হয়ে গেছে। এর কারণ বিশ্লেষণ করে যখন সে জানতে পারল যে, মাটির কলসী বারবার রাখার ফলেই পাথরটি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে তখন সে তার মনের ভিতর হারানো সাহস ও উদ্যম ফিরে পেল। ভাবল, বারবার মাটির কলসী রাখার ফলে যদি একটা পাথরও ক্ষয়ে যায় তাহলে বারবার চেষ্টার সাথে পড়ার পরেও আমার ব্রেনে দাগ পড়বে না এবং সবক মুখস্থ হবে না কেন? এই বলে পুনরায় নতুন উদ্যোগ নিয়ে সে মাদ্রাসায় ফিরে যায়। ভবিষ্যতে সেই ছাত্রই এক বড় পণ্ডিতরূপে খ্যাতি লাভ করে।

অনুরূপ আর এক ছাত্র একটি পিপড়েকে একটুকরা খাবার নিয়ে কোন দেয়ালে উঠতে অক্ষম ও পরক্ষণেই বারবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বহু চেষ্টার পর উঠতে সক্ষম দেখে নিজের উদ্যম ফিরে পেয়েছিল। এরূপ প্রত্যেক ছাত্রই যথেষ্ট মেহনত, সুদৃঢ় মনোবল ও অবিরাম সাধনা প্রয়োগ করলে বিদ্যায় পারদর্শী হতে পারে। কবি বলেন,

'পারিবো না' একথাটি বলিও না আর,
কেন পারিবে না তাহা ভাব একবার।
দশজনে পারে যাহা
তুমিও পারিবে তাহা
একবারে না পারিলে দেখ শতবার।'

তালেবে ইলমের উচিত, তার কিতাবের সহিতও আদব করা; মুসহাফকে মাটির উপর না রাখা, তাঁর প্রতি পা না করা, তা পিছন করে না বসা, আঙ্গুলে থুথু নিয়ে তার পাতা না উল্টানো, কোন কিতাবের নিচে তা না রাখা। হাদীস, তফসীর প্রভৃতি কিতাব; যাতে কুরআনী আয়াত বা আল্লাহর নাম আছে তা পা দ্বারা না ধরা, তার উপর হেলান না দেওয়া, যেখানে সেখানে ফেলে না রাখা, ঐরূপ পত্রিকার কাগজকে খাওয়ার দস্তরখান বা বসার সিট না করা। কিতাবের উপর কলম দ্বারা লিখে না খেলা; প্রয়োজনীয় টীকা ছাড়া অন্য কিছু না লিখা, এসব কিছু নষ্ট হয়ে গেলে কোন সম্মানিত স্থানে দাফন করা বা জ্বালিয়ে তার ছাই পবিত্র পানিতে ফেলা ইত্যাদি। এ আদব কাগজের প্রতি নয় বরং তা ইলমের প্রতি, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বাণীর প্রতি।

প্রয়োজনে সহপাঠীকে কিতাব পড়তে দেওয়া উচিত। সহপাঠীরও উচিত উক্ত কিতাবের যথার্থ হিফাযত করা। লিখার সময় 'বিসমিল্লাহ' লিখা ও বলা, আল্লাহর নামের সহিত 'তাআলা, সুবহানাহু, আয্যা অজাল্ল, তাবারাকা অতাআলা, রব্বুল আলামীন, রব্বুল ইয্যাত' ইত্যাদি লিখা ও বলা। নবী ﷺ এর নাম লিখার সময় দরূদ

সম্পূর্ণভাবে লিখা ও বলা। সাহাবাগণের নাম লিখার সময় 'রাযিয়াল্লাহু আনহু ﷺ, অন্যান্য আম্বিয়াদের নাম লিখার সময় 'আলাইহিস সালাতু অস্‌সালাম', অন্যান্য বিগত ওলামাদের নাম লিখার সময় 'রাহেমাহুল্লাহ' লিখা ইত্যাদি।

বই সংগ্রহ করা ভালো কাজ তবে তার সহিত তা সময় ও সাধ্যমত পাঠ করা অবশ্যই কর্তব্য। বই পুস্তককে পোকার খাদ্য না বানিয়ে নিজেকে বই-এর পোকা করলে অবশ্য লাভ হয়। কেবল সিলেবাসের বই পড়ে কর্তব্য পালন করে এবং অন্যান্য অতিরিক্ত বই না পড়ে অভীষ্ট লাভ হয় না।

তালেবে ইল্‌ম সকল পাঠ যথাসাধ্য হিফয্‌ করায় প্রয়াসী হবে অথবা বারংবার তা নিয়ে পুনরোনুশীলন করবে। যাতে কিতাবের বিষয় বস্তু যথার্থভাবে উপলব্ধ ও স্মৃতিস্থ হয়ে যায়।

ছাত্রের মান নির্ণয় করার জন্য পরীক্ষা এক মানদন্ড। ডিগ্রীই সবকিছু নয়। তালেবে ইল্‌মের উদ্দেশ্য বা শেষ চিন্তা যেন কেবল ডিগ্রী নেওয়াই না হয়। যেমন তার জন্য চিটিংবাজী করে পরীক্ষা দেওয়া হারাম। পরন্তু চিট করে পরীক্ষায় পাশ করে তার সার্টিফিকেট দ্বারা প্রাপ্ত চাকুরীর পয়সা খাওয়া বৈধ কিনা তাও ভেবে দেখা দরকার।

তালেবে ইল্‌ম ও আলেমের উচিত, বড়দের জ্ঞান ও অবদান স্বীকার করা, ইলমে আমানতকারী রাখা, নিজের মানসম্ভ্রম, ও ইজ্জতের খেয়াল রাখা এবং ইল্‌ম বহনের দায়িত্ব সদা অনুভব করা। যেহেতু আলেমের ইল্‌ম যত বাড়ে তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্যও তত বেড়ে চলে। তা ছাড়া তাঁরা হলেন, সাদা কাপড়ের মত। সামান্য দাগ লাগলেও তা সকলের চোখে লাগা স্বাভাবিক। তাই কোন প্রকার দাগ যাতে না লাগে সেই প্রচেষ্টা থাকাই উচিত।

শিক্ষকের কর্তব্য

মুদার্রেসের উচিত, প্রথমতঃ তালেবে ইল্‌মের ধীগুণ (অর্থাৎ কৌতুহল, শ্রবণ, আহরণ, স্মৃতিতে ধারণ বা স্মরণ, সন্দেহ বা তর্ক, সন্দেহ-নিরসন, অর্থবোধ ও মর্মাবধারণ এই অষ্টবিধ বুদ্ধিগুণ) পরীক্ষা করা, পড়ার যোগ্যতা ও ক্ষমতা অথবা দুর্বলতা লক্ষ্য করা এবং সেই অনুযায়ী তার উপর পাঠের দায়িত্ব প্রদান করা। তিনি শিক্ষার্থীর জন্য সর্বদা হিতাকাঙ্খী ও মঙ্গলকামী হবেন। এত চাপ দেবেন না যাতে সে বুঝতেও সুযোগ না পায়। কারণ, ছাত্র বুঝতে পারে ও মনে রাখে এমন পাঠ বুঝতে

পারে না অথবা ভুলে যায় এমন বহু পাঠ হতেও উত্তম। অনুরূপভাবে যাতে তালেব বুঝতে পারে তার বুঝশক্তি অনুপাতে দর্স বা পাঠ ব্যাখ্যা করবেন। সংক্ষিপ্ত বা বিশদভাবে যখন যেমন প্রয়োজন তখন তেমনিভাবে বুঝাবেন। নচেৎ বিপরীত করলে বিরক্ত হয়ে তালেবের বোধশক্তি বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে।

শিক্ষার মাধ্যম ভাষা উর্দু হলেও অতিমার্জিত উর্দু বলে ছাত্রদেরকে হতভম্ব করা অনুচিত। যাতে 'তোতার অর্থ বাবগা' বুঝে, কিন্তু তার মাতৃভাষায় তোতা কি তা না বুঝে তাহলে ফল বিপরীত হয়। ভারসাম্য রক্ষা করে মূল উদ্দেশ্য এই হওয়া উচিত, যাতে ছাত্র সুস্পষ্টভাবে পাঠ্যবিষয় নিজের ভাষাতেও বুঝে প্রকাশ করতে পারে।

সুতরাং উদাহরণস্বরূপ, ওস্তায বললেন, 'বুর্তাক্বাল কা মা'না সান্তারাহ।' ছাত্র প্রশ্ন করল, 'জী, সান্তারাহ কি জিনিস?' ওস্তায বললেন, 'দর্স্ উর্দু মেঁ হ্যায়, উর্দু মেঁ পূছো।' ছাত্র বলল, 'জী, সান্তারাহ কিয়া চীয হ্যায়?' ওস্তায বললেন, 'এক কিস্ম কা ফল হ্যায়।' বাস্! ছাত্র জানতেও পারল না যে ঐ কিসিমের ফল তার ঘরে আছে অথবা সে প্রায় খেয়ে থাকে। সে ভাবল, সে হয়তো আরবের কোন ফল। নচেৎ আমাদের দেশের কোন প্রসিদ্ধ ফল হলে নিশ্চয় ওস্তায ইঙ্গিত করতে অলসতা করতেন না।

এমনটি আমাদের বাংলার মাদ্রাসায় ঘটে থাকে। যার ফলে বাঙালী ছাত্রদের প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও তা প্রতিভাত হতে পায় না। কুরআন হাদীস শিক্ষার জন্য আরবী শিখবে, কিন্তু তার ব্যাকরণ শিখবে ফারসীতে, ফারসীর অনুবাদ হবে উর্দুতে, অথচ শিক্ষার্থীর মাতৃভাষা বাংলা। সম্ভবতঃ তাও সে ঠিকমত বুঝে না। এই জন্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দ্বীনী শিক্ষার্জনের অবস্থা অন্ধের পায়স খাওয়ার মত হয়েছে; অন্ধ যখন শুনল যে, তাকে পায়স খেতে দেওয়া হবে তখন সে প্রশ্ন করল, 'পায়স কি রকম?' একজন বলল, 'সাদা ধব্‌ধবে।' অন্ধ বলল, 'সাদা ধব্‌ধবে কেমন?' বলল, 'বকের মত।' অন্ধটি আবার প্রশ্ন করল, 'বক আবার কেমন?' তখন উত্তরদাতা বুঝল, অন্ধ মানুষ কথায় বুঝবে না; হাতের ইঙ্গিত ও ভঙ্গিমায় বুঝবে। তাই তার হাতটি ধরে বাঁকা করে বলল, 'এই দেখ, বক এই রকম হয়।' তখন অন্ধ বিস্ময়ের সাথে ভাবল, তাহলে পায়স বুঝি এত লম্বা আর এ রকম বাঁকা হয়? বলল, 'আমি পায়স খাব না!' (হয়তো গলায় আঁটকে যাবে তাই।)

ছাত্র বাংলা অথবা ইংরেজী গ্রামার পূর্বে পড়ে ও বুঝে থাকলে ওস্তায যদি তা আরবী গ্রামার পড়াবার সময় ঐ পরিভাষা বাংলা বা ইংরেজীর সহিত মিলিয়ে বুঝাতে পারেন

তাহলে সোনায় সোহাগা হবে এবং অল্প মেহনতে ছাত্র সহজে বুঝে যাবে। আর তা পড়তে তাকে মোটেই কষ্টবোধ হবে না।

একটি পাঠ বা মাসআলাহ তালেবের ভালোরূপে না বুঝা পর্যন্ত ওস্তায তাকে অন্য পাঠ বা মাসআলাহ পড়তে দেবেন না। পুনরালোচনার মাধ্যমে পূর্বের পাঠ বুঝেছে দেখলে পরের পাঠ দিলে উভয় পাঠই বুঝতে তার পক্ষে সহজ হবে। নচেৎ তার বুঝার পূর্বে এক মাসআলাহর উপর অন্য আর এক মাসআলাহর অনুশীলন দিলে প্রথমটি বিনষ্ট হবে এবং দ্বিতীয়টিও বুঝতে সক্ষম হবে না। আর এইভাবে পরবর্তী পাঠও উপলব্ধি করতে না পেরে একটার পর একটা বরং প্রায় সবটাই একত্রিত হয়ে মস্তিষ্কে এক প্রকার ক্লান্তি ও অবসাদ সৃষ্টি করবে। ফলে সে সব পুনরাবৃত্তি করতেও তার নিকট বিরক্তি ও আলস্য দেখা দেবে; যা ইলমের পথে বড় ব্যাঘ্যাত হয়ে দাঁড়াবে। আর তা অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করা মুআল্লেমের আদৌ উচিত নয়।

মুদার্রেসের উচিত, তালেবের ব্যাপারে সর্বদা মঙ্গল কামনা করা, বুঝতে না পারলে বারংবার বুঝিয়ে দিতে ধৈর্য ধারণ করা, তার বেআদবী ও অশিষ্টতার উপর সহনশীলতা অবলম্বন করা এবং যাতে সে সহজে বুঝতে পারে, আদব ও ভদ্রতা যাতে শিখতে পারে, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে এসে যাতে তাঁকেই সবকিছু মনে করতে পারে এবং ইলমের প্রতি বিরক্তি ও নৈরাশ্য প্রকাশ না করে তার প্রচেষ্টা করা। যেহেতু শিক্ষকের উপর শিক্ষার্থীর কিছু হক বা অধিকার আছে। ছাত্র হয়ে তাঁর নিকট এসে সেই ইল্ম শিক্ষা করতে নিরত হয়; যা তার জন্য এবং সমাজের জন্য উপকারী। ছাত্র যে ইল্ম তাঁর নিকট হতে গ্রহণ করে তা প্রকৃতপক্ষে তাঁরই সম্পদ ও পুঁজি। ছাত্র তা সংরক্ষণ করে এবং তাতে সমৃদ্ধি দান করে থাকে; যা এক লাভদায়ক উপার্জন। তাই ছাত্রই শিক্ষকের জন্য প্রকৃত পুত্র ও উত্তরাধিকারী। আল্লাহ পাক যাকারিয়াহ (আঃ) এর প্রার্থনা উল্লেখ করে বলেন, "সুতরাং তুমি তোমার নিকট হতে আমাকে উত্তরাধিকারী দান কর; যে আমার উত্তরাধিকারী হবে এবং উত্তরাধিকারী হবে ইয়াকুবের বংশের।---" *(সূরা মারয়্যাম ৬ আয়াত)* উদ্দেশ্য, ইল্ম ও হিকমতের উত্তরাধিকারী।

মুআল্লেম তাঁর তা'লীম দানের বিনিময়ে সওয়াব ও পুণ্যের অধিকারী হবেন; তাতে তালেব তা বুঝে কিংবা না বুঝে।। কিন্তু যদি সে তা বুঝতে পারে আর নিজে তদ্দ্বারা উপকৃত হয় এবং অপরকেও উপকৃত করে তবে মুআল্লেমের সওয়াব প্রবাহমান ও চিরস্থায়ী হবে। এ ওর ছাত্রকে সে তার ছাত্রকে এবং এইভাবে ধারাবাহিকতার সহিত

যেমন শিক্ষা চলতেই থাকবে তেমনি ঐ প্রথম মুআল্লেম এবং সেইরূপ তাঁর পরবর্তী প্রত্যেক মুআল্লেমের সওয়াব মরণের পরেও জারী থেকে যাবে। *(সঃ জামে' ৭৯৩নং)* এ এমন এক বাণিজ্য যার উপর প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করে!

সুতরাং মুআল্লেমের উচিত, সেই লাভজনক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা করা এবং তাতে যাতে সমৃদ্ধি ও উন্নতি লাভ হয় তার প্রতি আপ্রাণ চেষ্টা করা। কারণ এটা তাঁর এক আমল এবং আমলের এক স্মৃতি। আল্লাহ তাআলা বলেন, "আমিই মৃতকে জীবিত করি এবং লিখে রাখি ওদের কৃতকর্ম (যা ওরা আগে পাঠিয়েছে) এবং (ওদের স্মৃতি) যা ওরা পশ্চাতে রেখে যায়।" *(সূরা ইয়াসীন ১২)* অর্থাৎ আমলের সুফল ও উত্তম প্রভাব অথবা তার কুফল ও মন্দ প্রভাব লিপিবদ্ধ করা হয়।

তালেবকে প্রতি সেই উপায় ও পন্থার কথা মুআল্লেম জানিয়ে দেবেন যে উপায়ে তার পক্ষে সর্বপ্রকার পাঠ বুঝতে সহজ হয়, পঠনে উদ্যম ও উদ্দীপনা পায় এবং বুঝতে ও অভ্যাস করতে কোন রকমের কষ্ট বা শ্রান্তি অনুভব না করে। ওস্তাযের উচিত, যাতে ছাত্রদের পঠিত বিষয় তাদের নিকট স্মৃতিস্থ ও সংরক্ষিত থেকে যায় তার প্রচেষ্টা করা; বারংবার আলোচনা করতে তাকীদ দেওয়া, পুরানো পাঠের উপর মাঝে মাঝে প্রশ্নাদি করা, পরীক্ষা নেওয়া ও তাদের আপোস পুনরালোচনার উপর গুরুত্ব প্রদান করা। কারণ ওস্তাযের নিকট পাঠ গ্রহণ (ক্লাস) করায় কেবল বৃক্ষরোপণ করা হয় এবং পুনরালোচনা ও মুখস্থ ইত্যাদি করা তার সিঞ্চন, সার দান ও আগাছা দূরীকরণ করার ন্যায়। যাতে নির্বিঘ্নে ও সহজে বৃক্ষ বেড়ে ওঠে এবং শাখা-প্রশাখায় ও ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়ে ওঠে।

যে ইমাম বুখারীর ৬ লাখ হাদীস সনদ সহ মুখস্থ ছিল সেই বুখারীকে একদা তাঁর কাতেব গোপনে জিজ্ঞাসা করল যে, 'স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করার জন্য কোন ওষুধ আছে কি?' তিনি 'জানি না' বলে পুনরায় বললেন, 'স্মরণশক্তির জন্য সবচেয়ে বড় উপকারী জিনিস হল মানুষের (ইল্‌মের প্রতি) চরম আগ্রহ এবং বিরতিহীন পুনরাবৃত্তি।' *(হাদয়ুস্ সারী ৪৮৭পৃঃ)*

ইলম মনে রাখার এক সহজ-সরল উপায় ভদ্র বাদানুবাদ ও তর্কালোচনা। ওস্তাযের উচিত ছাত্রদের মাঝে এমন মার্জিত উপায় খুঁজে দেওয়া যাতে তারা আপোসে কোন মাস্‌আলাহ ও তার দলীলাদি নিয়ে বাদানুবাদ করতে পারে। যার কেবল একটাই উদ্দেশ্য হয়, হক সন্ধান। দলীল যাকে সমর্থন করে তারই অনুসরণ।

এই পদ্ধতিতে ছাত্রদের চিন্তাশীলতা, মননশীলতা, যুক্তিপূর্ণ প্রতর্কক্ষমতা এবং গবেষণার স্মৃতিদ্বার উদ্‌ঘাটিত হবে। ইলমের উৎসমুখ এবং দলীল ও তা উপস্থিত করার বিষয়ে পরিচিতি লাভ করবে। আর প্রকৃত হক ও সত্যের অনুসারী হতে শিখবে।

তবে এ প্রসঙ্গে সতর্কতার বিষয় যে, এ নিয়ে যাতে আন্তরিক মনোমালিন্য সৃষ্টি না হয়ে যায় অথবা বিতর্কের ভাষা যেন রূঢ় না হয়। নচেৎ হিতে বিপরীত হয়ে অনৈক্য ও কলহ সৃষ্টি হবে। ছাত্রদের উচিত, যেন তারা কোন বাক্য বা বক্তার জন্য 'তাআসসুব' বা অন্ধ-পক্ষপাতিত্ব না করে। তর্কের উদ্দেশ্য যেন সে যা বলেছে অথবা সে যার তা'যীম করে বা যাকে মানে তার কথার পৃষ্ঠপোষকতা করা না হয়। কারণ অন্ধ-পক্ষপাতিত্ব ও গোঁড়ামী ইখলাস নষ্ট করে ফেলে। ইসলামের সৌন্দর্য ধ্বংস করে দেয়। যথার্থতা, বাস্তব ও হক দেখতে হক অনুসন্ধানীকে অন্ধ করে ফেলে। ক্ষতিকর ঈর্ষা ও দ্বেষ এবং সর্বনাশী বিবাদ-বিছিন্নতা সৃষ্টি করে। যেমন ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতাই ইল্‌মের সৌন্দর্য। ইখলাস, পরহিতৈষিতা ও নিষ্কৃতি লাভের শিরোনাম।

তালেবের জন্যও জরুরী যে, সে তার ওস্তাযকে সম্মান ও সমীহ করবে। যথাসম্ভব ভদ্রতা ও আদবের সহিত তাঁর সহিত ব্যবহার করবে। যেহেতু তার উপর তাঁর বহু সাধারণ ও নির্দিষ্ট অধিকার আছে।

সাধারণ অধিকার যা তালেব ছাড়াও সাধারণ মুসলমানরা একজন আলেম ও মুআল্লেমের প্রতি স্বীকার করে থাকে। যেহেতু তিনি মঙ্গলের শিক্ষক। তাঁর শিক্ষা ও ফতোয়া দ্বারা সমগ্র সৃষ্টিকে তিনি উপকৃত করে থাকেন। তাই সকল মানুষের উপর তাঁর এমন অধিকার আছে যেমন একজন উপকারী ও অনুগ্রহকারীর অধিকার থাকে। আর তাঁর মত আর কারো উপকার ও অনুগ্রহ বড় হতে পারে না; যিনি মানুষকে শিক্ষা, চেতনা, সদাচারণ, সংস্কার, সংশুদ্ধি ও দ্বীনী আদর্শ দান করে থাকেন। ভালো-মন্দ, উপকার-অপকার ও মঙ্গলামঙ্গলকে চিহ্নিত করেন, যাঁর দ্বারা কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত ও নির্দেশিত হয়, অকল্যাণ ও মন্দ অপসারিত হয়, যিনি সমাজের মূর্খতার আঁধার দূর করে আনেন জ্ঞানের আলো। যিনি ধর্ম ও সত্যের বাণী বহন ও প্রচার করে থাকেন; যা তওহীদবাদী ও তার পরবর্তী সকল বংশধরের জন্য সর্বোত্তম কল্যাণ। বরং সমগ্র মানব জাতির জন্য তাঁর জ্ঞানের জ্যোতি চলার পথের দিশারী।

যেহেতু যদি ইল্‌ম না হত তাহলে মানুষ পশুর ন্যায় মূর্খতা ও অশ্লীলতার ঘোর অন্ধকারে দিক্‌দিশাহারা হত। প্রবৃত্তি ও ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে পশুর মত আচরণ করত। ইল্‌ম তো সেই আলোক; যদ্দ্বারা অন্ধকারে পথের ঠিকানা পাওয়া যায়। ইল্‌মই তো অন্তর, আত্মা, দ্বীন ও দুনিয়ার প্রাণ। যে দেশে এমন মানুষ নেই; যিনি সকলকে চরিত্র, আদর্শ ও মানবতা বা সৃষ্টিকর্তার পথনির্দেশ শিক্ষা দেবেন, প্রয়োজনে পথের দিশা দেবেন -সে দেশ সত্যই নিঃস্ব ও মিসকীন। যাঁর অভাব তাদের ইহ-পরলোক উভয় ক্ষেত্রেই ক্ষতিকারক, যদিও তারা রকেট, উপগ্রহ ও কম্পিউটার ইত্যাদির আবিষ্কর্তা হয়।

অতএব যাঁর উপকারিতা এত বৃহৎ, মানুষের মনুষ্যত্বের জন্য যাঁর প্রয়োজন ও প্রভাব এত বিরাট তাঁর প্রতি কেমন করে সমগ্র মুসলিম জাতির জন্য সম্মান, শ্রদ্ধা, সমীহ ও ভালোবাসা ওয়াজেব না হয়? তাঁর প্রাপ্য হক ও অধিকার কি কম বলা যায়?

তালেবের উপর ওস্তাযের নির্দিষ্ট অধিকারও অনেক। যেহেতু তিনি হলেন তার শিক্ষা ও আদবের গুরুভার বহনকারী। সে যাতে সুউচ্চ পদ ও মর্যাদায় পৌঁছতে পারে তার প্রতি আন্তরিক কামনা ও ইচ্ছা রাখেন। তাই পিতা-মাতার অনুগ্রহ ও উপকারও -একদিক হতে- সেই মুআল্লেম ও পালয়িতার উপকারের সমতুল নয় যিনি মানুষকে মানুষ হয়ে চলতে শিখান, সৎপথের পথিক করে প্রকৃত ও চিরসুখ ও শান্তির ঠিকানা বাতলে থাকেন। যাঁরা নিজের মূল্যবান সময় তার উপর ব্যয় করে থাকেন। সাধ্যমত নিজের সুচিন্তিত মত ও সিদ্ধান্ত দিয়ে তাকে সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে সাহায্য করে থাকেন।

পৃথিবীতে বহু শিক্ষক, বহু পালয়িতা এবং বহু ধরনের ওস্তায আছেন। তাঁদের অধিকাংশ ওস্তায বর্তমান জীবন হতে মরণ পর্যন্ত সময়কালীন সুখ-সামগ্রীর সন্ধান দিয়ে থাকেন। যাঁদের দৌড় কেবল গোর পর্যন্ত, মাত্র ষাট অথবা সত্তর বছরের প্রতিযোগিতায় তাঁরা অংশ গ্রহণ করে থাকেন। কিন্তু ঐ শিক্ষকের দৌড় (কেবল মসজিদ পর্যন্তই নয়;) অনন্তকালের। যিনি মরণের পরেও সুখ-সামগ্রীলাভের উপায়-উপকরণের খোঁজ দিয়ে থাকেন। এঁরা ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে সামান্য আয়ুতে ইহ-পরকাল উভয় জীবনের পরম স্বাচ্ছন্দ্য ও উন্নয়নের বিভিন্ন পথ ও পাথেয় আবিষ্কার (সংস্কার) করে থাকেন। কিন্তু “ওরা পার্থিব জীবনের বাহ্য দিক সম্বন্ধে অবগত। আর

পারলৌকিক জীবন সম্বন্ধে ওরা অনবধান।” *(সূরা রূম ৭আয়াত)* যদিও ‘ওঁরা’ তাঁদেরকে কেবল ‘মোল্লা’ রূপে চিনে থাকে।

কেউ যদি কোন মানুষকে কোন আর্থিক উপহার দান করে থাকে -যা কিছুদিন হিতসাধন করে ধ্বংস ও নষ্ট হয়ে যায় -তার উপর উপহারদাতার বড় হক থাকে এবং সে তার কাছে বাধিত হয়। তাহলে যিনি অমূল্য ইলমের সওগাত দান করেন, যদ্দ্বারা পার্থিব শান্তির জীবন লাভ করে এবং মরণের পরেও আখেরাতে চিরসুখ অর্জন করে। যাঁর হিতসাধন ও অনুগ্রহ ধারাবাহিকভাবে চিরস্থায়ী থাকে -তিনিই সবার চেয়ে অধিক শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র নিশ্চয়ই। যাঁর সহিত আদবপূর্ণ ব্যবহার করা, তিনি যা নির্দেশ করেন তার অনুসরণ করা, তাঁর ইঙ্গিতের বাইরে না যাওয়া ছাত্রের কর্তব্য। যেহেতু বিশেষ করে ইল্মী বিষয়ে তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন তা তার অজানা, তাই তাঁরই মতে নিজের জীবন গড়া উচিত। অবশ্যই তিনি তার শুভাকাংখী। ছাত্র বা পথ অনুসন্ধানকারী অর্থে আমীরজাদা হলেও তিনি তো ইলমের রাজা। পারলৌকিক ধনের কাছে পার্থিব ধনের যে কোন মূল্য নেই।

শিক্ষার্থী (অনুরূপ প্রত্যেক মুসলিম) আলেমের সামনে আদরের সহিত বসবে। নিজের জ্ঞানপিপাসা তাঁর নিকট প্রকাশ করবে। সম্মুখে ও পশ্চাতে তাঁর জন্য দুআ করবে। যদি কোন বিষয়ে জ্ঞান বা কোন কঠিন মাস্আলার ব্যাখ্যার ভেট পেশ করেন তবে তা সাদরে গ্রহণ করবে এবং সাগ্রহে শ্রবণ করবে। এরূপ ভাব প্রকাশ করবে না যে, সে আগে হতেই এটা জানত; যদিও বা সত্য-সত্যই পূর্ব হতেই জানত। প্রত্যেক ইল্ম অর্জনে ও আলাপনে সকল মানুষের জন্য এই আদব বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু দুঃখের বিষয় , আয়নার পারা খসে পড়ায় কারণে তার আর সে মূল্য ও কদর নেই। তাই আলেম সমাজেরও কদর কমে গেছে। তবে প্রকৃত আলেমের কদর অবশ্যই হারায়নি এবং হারাবেও না। খাদযুক্ত বা নকল সোনার মূল্য না থাকলেও খাঁটি সোনার উপর নর্দমার কাদা ছিটানো হলেও তার মূল্য অবশ্যই কমে না।

মানুষ মাত্রেই ভুল হয়। ওস্তায কোন বিষয়ে ভুল করলে, (মুত্বালাআহ না করে) ভ্রম অর্থ বা ব্যাখ্যা করলে (এবং তালেব তা ধরতে পারলে) তাঁকে বিনয় ও শ্রদ্ধার সাথে তা ধরিয়ে দেবে। নিজের বাহাদুরী প্রকাশের উদ্দেশ্যে ভরা মজলিসে তার অপমান করা, অথবা ‘আপনি ভুল বলছেন’ বা ‘আপনি যা বলছেন তা ঠিক নয়’ -ইত্যাদি বলে রুক্ষ কথায় মুখামুখি প্রতিবাদ করা উচিত নয়। বরং সহজ ও সুন্দর ভাষার ইঙ্গিতে তা বুঝিয়ে দেওয়া উচিত, যাতে তার অন্তর ব্যথিত না হয়। যেহেতু এও তাঁর

এক প্রকার প্রাপ্য হক। আর এই নিয়মে বড়দের কথায় প্রতিবাদ নির্ভুল ও সঠিকতায় পৌঁছতে সহায়ক হয়। অন্যথায় অন্তরে আঘাত দিয়ে, অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞার সাথে তাঁদের কথা খণ্ডন করলে এক প্রকার প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ভাব সৃষ্টি হয়, যার দরুন প্রকৃত হক ও সঠিকতায় পৌঁছতে বাধা পরে থাকে।

অবশ্য মুআল্লেমের জন্যও একান্ত কর্তব্য যে, ছাত্র কোন ভুল সংশোধন করে দিলে তাতে লজ্জিত ও ক্রোধান্বিত না হওয়া এবং সঠিক ও সত্যকে গ্রহণ করে নেওয়া। যে কথা বলে ফেলেছেন সেটাকেই সাব্যস্ত রেখে সঠিক ও হক গ্রহণ না করা আলেমের এক ত্রুটি। কারণ হকের অনুসরণ করা সর্বদা ওয়াজেব এবং তাই ইনসাফ ও ন্যায্যতা; চাহে সে হক কোন বড়র হাতেই থাক অথবা কোন ছোটর হাতে।

ওস্তাযের জন্য এটা এক আল্লাহর প্রদত্ত নিয়ামত বা অনুগ্রহ যে, তাঁর ছাত্রদের মধ্যে এমন ছাত্রও আছে, যে তাঁর ভুল সংশোধন করতে পারে, সঠিকতার প্রতি ভুলে যাওয়া পথ প্রদর্শন করতে পারে। যাতে ভুলের উপরেই চির অবিচলতা দূর হয়ে যায় এবং ইল্মী পরিপূর্ণতা লাভ হয়। এমন নেয়ামতের উপর আল্লাহর দরবারে লাখ শুক্র জ্ঞাপন করা কর্তব্য এবং তারপর তার শুকরিয়া আদায় করা উচিত, যার হাতে আল্লাহ তাঁর ইলমী পরিপূর্ণতা দান করেন; চাহে সে তাঁর ছাত্রই হোক বা অন্য কেউ।

অনেক আলেম আছেন, যাঁকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি তার উত্তর না জানলেও নিজের তরফ হতে মনগড়া কোন একটা উত্তর দিয়ে থাকেন; যাতে তাঁর সম্মানের লাঘব না হয়। কোন কোন সময় অনুমানের তীর লেগেও যায় বটে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা ভুল হয়; যা প্রশ্নকারী শিক্ষার্থীর পক্ষে এক মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অথচ আলেমের পক্ষে ওয়াজেব এই যে, যে বিষয়ে তাঁর ইল্ম নেই সে বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হলে 'আল্লাহু আ'লাম' (আল্লাহই জানেন) অথবা স্পষ্টভাবে 'জানি না' বলা, আর এতে তাঁর সম্মান হানি হবার কিছু নেই, বরং এতে তাঁর ইজ্জত আরো বর্ধমান হয়। কারণ এরূপ নীতি অবলম্বন করা দ্বীনী ও ঈমানী পরিপূর্ণতা এবং তাঁর সত্যানুসন্ধিৎসার পরিচায়ক। ইমাম শাফেয়ী তাঁর ওস্তায ইমাম মালেক প্রসঙ্গে বলেন, 'একদা তিনি ৪৮টি মাস্‌আলা বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হলেন। কিন্তু এর মধ্যে ৩২টির প্রশ্নের উত্তরে তিনি 'জানি না (বা জানা নেই)' বললেন!

ইমাম গাযালী বলেন, 'এই ঘটনা এই কথার দলীল যে, তিনি ইল্ম প্রচারে আল্লাহর সন্তুষ্টিই কামনা করতেন। নচেৎ যে ব্যক্তির উদ্দেশ্য অন্য কিছু হয় সে ব্যক্তির মন

তার গহীন কোণেও কোন মতেই স্বীকার করবে না যে, 'এ বিষয়ে সে জানে না।' *(ইহয়াউ উলুমিদ্দীন)*

পক্ষান্তরে এই তাওয়াক্কুফে (কোন বিষয়ে কোন মন্তব্য করা থেকে বিরত হওয়াতে) বহু উপকারও আছে। যেমন, অজানা বিষয়ে তাওয়াক্কুফ ওয়াজেব; তাই তাঁর ওয়াজেব পালন হয়।

তিনি যখন তাওয়াক্কুফ করে 'আল্লাহ আ'লম' বলে নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করবেন তখন তার পরপরই পুস্তকালোচনায় সে বিষয়ে ইল্‌ম লাভ করে সবল হবেন এবং ছাত্ররা যখন ওস্তাযের তাওয়াক্কুফ দেখবে তখন তারাও নিজে নিজে সে বিষয়ে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে প্রতিযোগীতামূলক অনুসন্ধান শুরু করবে ও উক্ত প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ করে ওস্তাযকে তোহফা দেওয়ার চেষ্টা করবে।

আলেম যখন অজানা বিষয়ে তাওয়াক্কুফ করবেন তখন যে বিষয়ের তিনি ব্যাখ্যা দেবেন তা সকলের নিকট অধিক গ্রহণযোগ্য ও প্রণিধানযোগ্য হবে এবং তাঁর বিশ্বস্ততা ও আমানতদারীও প্রতিপাদিত হবে। যেমন যিনি জানা অজানা সব বিষয়ের মুখ চালান বলে পরিচিত তাঁর প্রত্যেক কথা -এমন কি যা স্পষ্ট সত্য তাও -বিশ্বাস ও গ্রহণ করতে সকলের মনে আশঙ্কা ও সংশয় জন্মাবে।

ছাত্ররা ওস্তাযের অজানা বিষয়ে তাওয়াক্কুফ দেখলে তা তাদের জন্যও তা'লীম হবে এবং কথার চেয়ে কাজের মাধ্যমে তা'লীম তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়ে তারাও অজানা বিষয়ে তাওয়াক্কুফ করতে শিখবে। তাহলে ভবিষ্যতে কাউকে ভুল শিক্ষা দেবে না বা আন্দাজে ফতোয়া দিয়ে কারো বিপদ আনবে না।

তবে আলেম যদি মাহের ও যোগ্য হন অথবা পড়াবার পূর্বে মুত্বালাআহ (পাঠ্যবিষয়ে পূর্বালোচনা) করেন তবে এসব ভুলের আশঙ্কা থাকে না। বরং মাহের হলেও অন্ততঃপক্ষে একবারও মুত্বালাআহ করা প্রয়োজন। যাতে ছাত্রদের সম্মুখে লজ্জিত হতে না হয়।

ওস্তাযের প্রতি যেমন সম্মান ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবে তেমনি ছাত্র তার সহপাঠীর সহিতও সম্প্রীতি ও সদ্ভাব বজায় রাখবে। যেহেতু এ সহপাঠে একে অপরের উপর বড় হক ও অধিকার থাকে। ভ্রাতৃত্ব সাহচর্যের হক, একই ওস্তাযের প্রতি সম্পর্ক স্থাপনের হক এবং তারা তাঁর নিকট তাঁর সন্তানের ন্যায় -সে হিসাবে (ভ্রাতৃত্বের) হক রয়েছে। তাই আপোসে সহানুভূতি, সহায়তা এবং যৌথ সফলতার উপর মিলিত

প্রচেষ্টা ও প্রযত্ন থাকা উচিত। প্রকাশ যে, ভ্রাতৃত্ববোধে কোন ভাষা বা এলাকাভিত্তিক কোন ভেদাভেদ ও বৈষম্য নেই।

সহপাঠীদের আপোসের জমায়েত যেন কেবল লাভ ও মঙ্গলের উদ্দেশ্যে হয়। যে পাঠ বুঝতে পারেনি সে -যে পাঠ বুঝতে পেরেছে তার নিকট বুঝে নেবে। একত্রে বসে পাঠালোচনা করবে। আজকের পাঠ আয়ত্ত করে আগামী কালের পাঠ্যবিষয় পরস্পর পূর্বালোচনা করবে। যাতে ওস্তাদের নিকট গিয়ে তা বুঝতে অধিক কষ্ট না হয়। এক অপরের ভুল সংশোধন করবে এবং ইলমে প্রতিযোগিতা করবে। তবে কেউ কাউকে ভুল নির্দেশ দিবে না অথবা সত্য বিষয় গুপ্ত করবে না। প্রতিযোগিতা হবে কিন্তু আপোসের মাঝে কোন হিংসা থাকবে না। সকলের উদ্দেশ্য হবে প্রকৃতার্থে আলেম হয়ে দ্বীন ও সমাজের খিদমত করা।

এখানে উল্লেখ্য যে, হিংসায় হিংসুটের মনে পরশ্রীকাতরতা ও পরের ক্ষতি হোক - এই প্রবৃত্তি ও বাসনা থাকে। ইল্ম বা কোন বিষয়েই তা বৈধ নয়। তবে পরের ইল্ম অথবা কোন সম্পদ দেখে ঈর্ষা করে তার মত অর্জন করতে প্রয়াস করা এবং তার কোন প্রকার ক্ষতির কামনা না করা অবশ্যই প্রশংসার্হ কর্ম। ইল্ম ও বদান্যতায় এই ধরনের হিংসা করতে হাদীসে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। *(বুখারী, মুসলিম প্রমুখ, সহীহুল জামে' ৭৪৮৮নং)*

তালেবে ইল্ম ও আলেমের জন্য একটি জরুরী বিষয় যে, তিনি যে ইল্ম শিক্ষা করেন বা দেন তার গুণে সর্বাগ্রে নিজেকে গুণান্বিত করা। যে সদাচরণ, সৎকার্য ও সুশিক্ষা তিনি জানেন ও জানান তদ্দ্বারা অলঙ্কৃত হওয়া সর্বপ্রথম তাঁরই প্রয়োজন। প্রথম তাঁরই জন্য সমুচিত, নোংরা ও অশ্লীল আচরণ হতে নিজেকে বহু দূরে রাখা, প্রকাশ্য ও গুপ্ত ওয়াজেব কর্ম এবং তদনুরূপ মুস্তাহাব কর্ম পালন করা এবং হারাম ও মকরূহ কর্ম বর্জন করা। যেহেতু সাধারণ মানুষ হতে তিনি ঐ ইল্ম দ্বারাই বিশিষ্ট হন। যতটা পাপ তাঁর হবে ততটা অন্য কারো হবে না। কারণ, তিনিই হন অভিজ্ঞ, সাধারণের আদর্শ এবং সমাজের অনুসরণীয়। আর সাধারণ মানুষের প্রকৃতি ও স্বভাবই হচ্ছে প্রায় সর্ববিষয়ে আলেম ও জ্ঞানীদের অনুসরণ করা -তিনি তা চান বা না চান। তাই যদি তিনি স্বীয় ইল্ম অনুযায়ী আমল না করেন তবে নিশ্চয় সমাজের জাগ্রত চক্ষুর খোঁচা হন। অথবা তাঁর অবহেলা দেখে সাধারণ মানুষও ধর্মীয় বিষয়ে অবজ্ঞা করতে শুরু করে এবং লোকেরা তাঁকে নিজেদের কর্মাকর্মের দলীল ও

আদর্শরূপে ব্যবহার করে। ফলে আলেম তখনই নিজের জন্য এবং সমাজের জন্য জালেমরূপে প্রতীয়মান হন।

সলফে সালেহীন ইল্‌ম অনুসারে আমল দ্বারা ইলম শিক্ষায় সাহায্য নিতেন। ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করলে ইল্‌ম স্থিত থাকে, দীর্ঘস্থায়ী হয়ে বৃদ্ধি ও বর্কত লাভ করে থাকে। নচেৎ আমল ত্যাগ করলে ইল্‌ম প্রস্থান করে এবং তার বর্কত বিলীন হয়ে যায়। অতএব আমলের সুফলই হচ্ছে ইলমের আত্মা, প্রাণ ও পদদৃঢ়কারী।

আলেম ও তালেবে ইলমের কর্তব্য, তাঁরা যা শিখেন বা জানেন তা যথা সাধ্য প্রচার করা, নিজে উপকৃত হয়ে অপরকে উপকৃত করা। এমন কি যদি কেউ একটি মাসআলাহও শিখে থাকে তবে তা অপরের নিকট পৌঁছে দেওয়া। সেই প্রচারে তাঁর ইল্‌মে বর্কত হবে, যেহেতু ইল্‌মের ফল ফলার অর্থ আমল করা এবং তা ইল্‌মহীন ব্যক্তিদের নিকট বিতরণ করা; যা ইলমের এক প্রকার যাকাত দান করা হয়। সুতরাং যে তার ইলম নিয়ে কৃপণতা করে তার মরণের সাথেই তার ইল্‌মও মারা যায়। কখনো বা জীবিত থাকতেই তার সঙ্গ ত্যাগ করে। অথচ প্রচার ও প্রসারণের মাধ্যমে ইল্‌ম নবজীবন লাভ করে এবং সংরক্ষিত থাকে। যেহেতু আল্লাহ তাআলা বান্দাকে তার কর্মের সদৃশ বদলা দান করে থাকেন।

অল্পে তুষ্ট হওয়া এবং পরিমিত ব্যয় করা সকলের পার্থিব কর্মে বাঞ্ছিত গুণ। বিশেষ করে যাঁরা জ্ঞানচর্চায় অভিনিবিষ্ট হন তাঁদের জন্য তা একান্তভাবে জরুরী। যেহেতু ইলম এক প্রকার বৃত্তি; যা সমস্ত অথবা কিছু কাজের বিনিময়ে তা ধরে রাখতে হয়। তাই অল্পে তুষ্ট না হলে বা পরিমিত ব্যয় না করলে এমন জীবিকার দরকার হয় যাতে সুখ-সামগ্রীর আতিশয্য লাভ হয় এবং সেই জীবিকায় ব্যাপৃত হলে ইল্‌ম বৃত্তির জন্য সময় কমে যায় অথবা সময় পাওয়াই যায় না; যাতে ইল্‌মও নিরুদ্দেশ হতে থাকে। সুতরাং মিতব্যয়ী ও অল্পে তুষ্ট হলে পার্থিব কাজের চাপ কমে যাবে এবং সেই সময় নিয়ে ইল্‌ম আলোচনায় মনোযোগী হওয়া সহজ হবে।

উলামা ও পরচর্চা

কোন নির্দিষ্ট আলেম বা সাধারণ লোকের চর্চা বা নিন্দা করা, কারো চুগলী ও হিংসা করা, অনুমান ও ধারণা করে কারোর বদনাম ইত্যাদি করা আহলে ইলমের জন্য

আদৌ সমীচীন নয়। কারণ, তা সকলের জন্য মহাপাপ, এবং আহলে ইলমের জন্য আরো বড় মহাপাপ, যেহেতু সাধারণ লোক তাঁদের অনুসরণ করে, আলেম যা করেন তাই তার কার্যের জন্য দলীল মনে করে। তাছাড়া পরচর্চা ও পরনিন্দায় বিদ্বেষ ও বিবাদ সৃষ্টি হয় এবং বহু মূল্যবান সময় অযথা নষ্ট হয়। যাতে ইল্‌মের আলোক ও আলেমের প্রতি ভক্তি অন্তর্হিত হয়ে যায়।

ওলামাদের জন্য আরো এক জরুরী কর্তব্য যে, তাঁরা যেন তাঁদের আপোসে ঐক্য, সংহতি, সৌহার্দ্য, সদ্ভাব, পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সম্প্রীতি ইত্যাদি বজায় রাখেন এবং অনৈক্য বিদ্বেষ, মাৎসর্য, বৈরিতা প্রভৃতি নিন্দনীয় ও সর্বনাশী কাজ-কর্ম থেকে দূরে থাকেন। সকল কাজে ইখলাস রেখে, সকলের ইজতেহাদী অভিমতকে শ্রদ্ধাদৃষ্টিতে দেখে, শৃঙ্খলা, বিনয় ও নিষ্ঠার সহিত সত্যের পরিচয় জানিয়ে সর্বদা একতার খেয়াল রাখবেন। সকলের যৌথ প্রচেষ্টায় ভ্রাতৃত্ববোধ ও সম্প্রীতির সুন্দর পরিবেশ ফুটিয়ে তুলবেন। যেহেতু সকলের উদ্দেশ্য এক, ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা এক, হিতৈষণাও এক। অতএব এই মহান উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা (দ্বীন প্রতিষ্ঠা)কে বাস্তবায়িত করতে অবশ্যই মিলিত প্রীতিপূর্ণ প্রয়াসের দরকার। এই সুসাধ্য সাধনের পথে সকল প্রকার ক্ষতিকর উপাদান ও উদ্দেশ্যকে প্রতিহত ও নির্মূল করতে আদৌ অলসতা করা উচিত নয়। সুতরাং এক আলেম অপর আলেম ভাইকে শ্রদ্ধা করবেন ও ভালোবাসবেন। এক অপরের তরফ হতে মান সংরক্ষা, প্রতিবাদ ও দোষক্ষালন করবেন। প্রমাণ করবেন যে, গৌণ (ইজতেহাদী মাস্‌আলা) বিষয়ে সামান্য মতভেদ - যা সম্প্রীতি ও সদ্ভাব নষ্ট করে -তাকে মুখ্য (আকীদা ও তাওহীদ) বিষয় -যাতে ঐক্য ও মিলন প্রতিষ্ঠা হয় -তার উপর প্রাধান্য দেওয়া যাবে না। বরং মুখ্য বিষয় ঠিক রেখে গৌণ বিষয়ে আপোসে সমঝতা ও মীমাংসার মাঝে আপোস নিষ্পত্তি করা কর্তব্য। আর এ বিষয়ে সালিস, সন্ধিকর্তা ও ফায়সালাকারী হবে কিতাব ও (সহীহ) সুন্নাহ। ছোট-খাট ইজতেহাদী ভুলের জন্য আপোসের সদ্ভাবকে অবশ্যই নষ্ট করা যাবে না। আর সাবধান হবেন, যাতে ইলমের (কিতাব ও সুন্নাহর) দুশমনরা তাঁদের আপোসের মাঝে বৈরিতা ও বিদ্বেষ ছড়াতে এবং একতাবদ্ধ জামাআতের মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতে কৃতার্থ না হয়।

সম্প্রীতির মত সম্পদের প্রতিষ্ঠায় যে লাভ ও কল্যাণ আছে তা বলাই বাহুল্য। সদ্ভাব এমন এক ধর্মীয় বিধান যার উপর শরীয়ত সর্বতোভাবে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করে। যা ইখলাস (ঐকান্তিকতা) উৎসর্গ ও স্বার্থত্যাগের এক বড় দলীল। আর

উৎসর্গ ও ইখলাস দ্বীনের প্রাণ ও কেন্দ্রবিন্দু। আলেম এই গুণে গুণান্বিত হয়েই সেই আলেম হন; যে আলেম ও আহলে ইলমের প্রশংসা কুরআন ও হাদীসে করা হয়েছে।

সম্প্রীতি ও সদ্ভাবের মাধ্যমে ওলামাদের ইল্‌মী উন্নতি লাভ হয়। আর ইল্‌মী পরিপূর্ণতার প্রতি পৌঁছনোর জন্য তাঁদের পথ প্রশস্ত ও সুগম হয়। কারণ, আহলে ইলমের পথ ও পদ্ধতি যখন এক হবে তখন এক অপরের নিকট নিঃসংকোচ ও অকুণ্ঠভাবে ইল্‌ম শিক্ষা ও জ্ঞানলাভ করতে প্রয়াসী হবেন। এক অপরের হিতার্থে তাঁকে শিক্ষা দেবেন। কিন্তু যদি দলাদলি করে একদল অপরদল হতে বৈমুখ থাকেন এবং আপোসে হিংসা ও ঘৃণায় জর্জরিত থাকেন তবে নিশ্চয় সে উপকার আর থাকে না। বরং তার পরিবর্তে অপকারই বিরাজ করে। হিংসা, বৈরিতা, অন্ধ পক্ষপাতিত্ব, নাহক রক্ষণশীলতা, গোঁড়ামি, এক অপরের ছিদ্রান্বেষণ এবং তার মাধ্যমে অপরের সমালোচনা, অপবাদ, অপযশ ও অপপ্রচারের শিকার করে। যার প্রত্যেকটিই দ্বীন, জ্ঞান ও সলফে সালেহীনদের রীতির পরিপন্থী; অনেক জাহেল যাকে দ্বীন মনে করে থাকে। অথচ আলেমের উচিত, সূরা হুজুরাত গভীরভাবে অধ্যয়ন করা।

মানুষ হয়ে ভুল করা আশ্চর্যের কথা নয়। বরং আশ্চর্য ও বিস্ময়ের কথা তো এটাই যে, 'মানুষ হয়েও কোন ভুল না করা।' অতএব আলেম যত বড়ই হন তাঁর দ্বারা কোন ভুল হওয়াটা বিস্ময়ের কথা নয়, যেহেতু মানুষ কেউই ত্রুটিমুক্ত নয়। (অবশ্য আম্বিয়াদের কথা স্বতন্ত্র।) তাই কোন ত্রুটিকে কেন্দ্র করে কোন আলেমের ইজ্জত ও সম্ভ্রমের উপর হামলা করা বড় অন্যায় ও যুলুম। যার শাস্তি একাধিক ভয়ানক।

ছিদ্রান্বেষণ করা মুসলিমের কর্ম নয়। মুসলিমদের চরিত্র নয়, কোন খবর শোনামাত্র তা হাওয়ায় উড়িয়ে বেড়ানো। এক অপরের মুখ থেকে গ্রহণ করে সত্যাসত্য বিচার না করে অন্ধভাবেই না বুঝে-সুঝে প্রচার করা। ইসলাম-বিরোধী প্রচার-মাধ্যমগুলোর রায়ে সায় দিয়ে নিজেদের ভক্তিভাজনদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হওয়া। অথবা কোন অসদুপায়ে (যেমন, শির্কী তাবীয লিখে, স্বামী-স্ত্রী বা প্রেমিক-প্রেমিকার মাঝে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ সৃষ্টি করে, যোগ-যাদু করে) সমাজের মাল ভক্ষণ করে তাদের বিরুদ্ধ মন্তব্য শোনা। এ ব্যাপারে রব্বুল আলামীন বলেন, "হে মুমিনগণ! যদি কোন ফাসেক (সত্যত্যাগী) তোমাদের নিকট কোন বার্তা আনয়ন করে, তাহলে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে। যাতে অজ্ঞতাবশতঃ তোমরা কোন সম্প্রদায়কে আঘাত না কর এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও। *(কুঃ ৪৯/৬)*

তিনি অন্যত্র বলেন, "আর যখন শান্তি অথবা ভয়ের কোন সংবাদ তাদের কাছে আসে তখন তারা প্রচার করে, অথচ যদি তারা রসূল কিংবা তাদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের গোচরে তা আনত, তবে তাদের মধ্যে যারা তথ্য অনুসন্ধান করে তারা তার যথার্থতা নির্ণয় করতে পারত। তোমাদের প্রতি যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত তবে তোমাদের কিছু লোক ছাড়া সকলে শয়তানের অনুসরণ করতে।" *(কুঃ ৪/৮৩)*

মুসলিমের উচিত, কোন মানুষের (বিশেষ করে কোন আলেমের) সদ্গুণ ও অবদানকে অস্বীকার না করা এবং কোন ভুল বা অপরাধ করলে তাতে আনন্দবোধ না করা। অথবা তাঁর অপযশ রটিয়ে নিজের কীর্তিত্ব জাহির না করা। বরং যথাসম্ভব তাঁর সংশোধনের উপায় অনুসন্ধান করা তার কর্তব্য।

মুসলিমের কর্তব্য প্রত্যেকের ছোট-খাট ও ইজতেহাদী ভুলকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখা। সুধারণার সহিত সে সবের উপর অনুচিত গুরুত্ব দিয়ে ভুলকারীর ইজ্জত না লুটা।

এ বিষয়ে ইমাম সানআনী (রঃ) বলেন, 'ওলামাদের এমন কোন ব্যক্তি নেই যাঁর কোন ত্রুটি বা উদ্ভট্টি নেই; যা তাঁর অন্যান্য অবদানের পার্শ্বে চাপা পড়া উচিত এবং সেই ত্রুটি থেকে বেঁচে থাকা কর্তব্য। (অর্থাৎ তা ধরে বসে প্রচার করে তাঁর মান ক্ষুন্ন করা অথবা তা মান্য করা উচিত নয়।' *(সুবুলুস সালাম)*

আবু হিলাল আস্কারী বলেন, 'অভিজ্ঞ ও প্রজ্ঞাবান আলেমের অনিচ্ছাকৃত দু'-একটি ত্রুটি তাঁর সুউচ্চ মর্যাদার লাঘব করে না। যেহেতু আল্লাহ যাঁকে বাঁচিয়েছেন তিনি ছাড়া কেউই ভুল থেকে মুক্ত ও পবিত্র নয়। জ্ঞানীরা বলেন, মহৎ সেই ব্যক্তি যার ত্রুটি গণনা করা যায়--।'

আল্লামাহ যাহাবী (রঃ) বলেন, 'জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ ওলামাদের মধ্যে কোন আলেমের সঠিকতা অধিক হলে, তাঁর সত্যানুসন্ধিৎসা সুপরিচিত হলে, জ্ঞানের পরিসর বেশী হলে, তাঁর বুদ্ধিমত্তা বিকশিত থাকলে, তাঁর সংশুদ্ধি, সংযমশীলতা ও (কিতাব ও সুন্নাহর) আনুগত্য প্রসিদ্ধ হলে - তাঁর বিচ্যুতি ক্ষমার্হ। তাঁকে আমরা ভ্রষ্ট বলে আখ্যায়িত করতে পারি না। তাঁকে আমরা বর্জনও করতে পারি না; আর পারি না তাঁর অবদান ও সদগুণাদিকে ভুলতে। তবে হ্যাঁ, আমরা তাঁর বিদআত বা ভুলের অনুকরণ বা অনুসরণ করব না। এবং তার জন্য তওবা ও প্রত্যাবর্তনের আশা রাখব।" *(সিয়ারু আ'লামিন নুবালা' ৫/২৭১)*

তিনি মুহাম্মদ বিন নস্র আল মরুযীর তরফ থেকে প্রতিবাদ করে বলেন, 'যখনই কোন ইমাম ছোট-খাট মাসায়েলে মার্জনীয় ক্রটি করেন তখনই যদি আমরা তাঁর উপর আক্রমণ শুরু করে দিই; তাঁকে বিদআতী বলি এবং তাঁর সাথে বয়কট করি তাহলে কেউই (ক্রটিহীন) অবশিষ্ট থাকবে না; না ইবনে নস্র, আর না ইবনে মান্দাহ, আর না-ই তাঁরা যাঁরা তাঁদের চেয়েও বড়। পরন্তু আল্লাহই সৃষ্টিকে সত্যের প্রতি পথপ্রদর্শন করেন এবং তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ করুণাময়। সুতরাং আমরা আল্লাহর নিকট কুপ্রবৃত্তি ও পরুষতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।'

ইমাম গাযালীর কিছু পদস্খলন উল্লেখ করার পর বলেন, 'গাযালী একজন বড় আলেম। কিন্তু কোন আলেমের জন্য এটা শর্ত নয় যে, তিনি ভুল করবেন না।' *(ঐ ১৯/৩৩৯)*

'অতএব আল্লাহ রহম করেন ইমাম আবু হামেদ (গাযালী)কে। জ্ঞান ও মর্যাদায় তাঁর নযীর কে আছে? কিন্তু ক্রটি-বিচ্যুতি হতে আমরা তাঁকে পবিত্র বলে দাবী করি না। (যেহেতু তিনি সূফীবাদে বিশ্বাসী ছিলেন)। আর অসূল (মৌলিক বিষয়ে) কোন তকলীদ (অন্ধানুকরণ) নেই।' *(ঐ ১৯/৩৪৬)*

যেমন ইমাম নওবী, ইবনে হাজার প্রভৃতি উলামারও বড় বড় ক্রটি ছিল। তাঁরা আল্লাহর স্পষ্ট গুণাবলীর দূর ব্যাখ্যা (তা'বীল) করতেন এবং সূফীবাদের কতক আকীদাহ তাঁদের মাঝেও ছিল! তবুও আমরা একথায় বিশ্বাসী যে, 'পানির পরিমাণ দুই কুল্লা (২৭০ লিটার) হলে এবং তার উপর সামান্য অপবিত্র পড়লে তাতে কোন প্রভাব পড়ে না। আর ঐ পানি অপবিত্র ও ব্যবহার-অযোগ্য হয়ে যায় না। যেমন একথাও জানি যে, প্রদীপ্ত সূর্যের পাশে ছোট ছোট তারকারাজি অদৃশ্য ও বিলীন হয়ে যায়।

তাই তো বড় আলেমের বিরাট ইলমী অবদানের কাছে তাঁর ছোট-খাট দু'-একটি ভুল ধর্তব্য নয়। মুসলিম ঐ ধরনের আলেমদের নিকট হতে তাঁদের সঠিক ইল্ম দ্বারা উপকৃত হতে ভুল করে না। অবশ্য সে তাঁদের ভুলের অনুসরণ করে না এবং তা নিষ্ঠা ও শিষ্টতার সহিত প্রকাশ ও প্রচার করতে এবং সাধারণ মানুষকে সে বিষয়ে সতর্ক করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। বরং তাঁদের অবদানের কাছে তাঁদের ঐ সামান্য ক্রটির কথা বিস্মৃত হয় এবং তাঁদের ঐ ভুলের কারণে তাঁদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে।

তবে বিদআতী ওলামাদের ক্ষেত্রে ভিন্ন কথা। তাদের থেকে মুসলিমকে ভয় করা ও সাবধান থাকা উচিত। তাদের বিদআত থেকে সর্বসাধারণকে সতর্ক করা ওয়াজেব। যাদের সহিত মিলামিশা উচিত নয়। তাদের নিকট ইল্ম অনুসন্ধান করাও অনুচিত। কারণ, তা হলাহল জহর। *(আত্‌তাআলুম)*

এক গ্লাস দুধে এক বিন্দু গোমূত্র পড়ার মত বিদআতীর অন্যান্য কীর্তিও পন্ড এবং দৃষ্টিচ্যুত হয়।

পক্ষান্তরে হে মুহতারাম! আপনি যদি সত্যানুসারী হয়েও পরশ্রীকাতর ও হিংসুকদের শিকার ও তাদের লিখন ও বক্তৃতার বিষয় হন তাহলে মনোযোগপূর্বক এই উপদেশ গ্রহণ করুনঃ-

১- আপনি যে দুই পবিত্র ওহীর জ্যোতির্ময় উজ্জ্বল সত্যে প্রতিষ্ঠিত, সলফে সালেহীনদের যে সঠিক পথের আপনি পথিক সেই সত্য ও সুপথে আপনি নির্বিচল থাকুন। নির্বিকার-চিত্তে তারই প্রতি মানুষকে আহ্বান করুন। আপনার সম্পর্কে বিরুদ্ধবাদীদের অন্যায় মন্তব্য ও কথা এবং গুজব রটনাকারীদের অমূলক প্রচারণা যেন আপনাকে ঐ নীতি ও পথ হতে বিচলিত না করতে পারে। নচেৎ আপনি ভ্রষ্ট হয়ে যাবেন।

হাফেয ইবনে আব্দুল বার্র (রঃ) এর এই স্বর্ণটুকরার মত কথাটিকে আপনি আপনার ভগ্ন অন্তরাধারে কুড়িয়ে রাখুন; তিনি বলেন, 'যাঁরা আবু হানীফা (রঃ) থেকে রেওয়ায়েত (বর্ণনা) করেছেন, তাঁকে আস্থাভাজন ও বিশ্বস্ত বলেছেন এবং তাঁর প্রশংসা করেছেন তাঁদের সংখ্যা তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচকদের অপেক্ষা অধিক। আর আহলে হাদীসদের মধ্য হতে যাঁরা তাঁর সমালোচনা করেছেন তাঁরা অধিকাংশ তাঁর রায়, কিয়াস এবং ইরজা' (ঈমান অন্তরে বিশ্বাস ও মুখে উচ্চারণের নাম, আমল ঈমানের মূল অংশ নয় এই অভিমত)এ নিমজ্জিত হওয়ার ফলে তাঁর নিন্দা করেছেন। তাঁর প্রসঙ্গে বলা হত যে, তাঁর ব্যাপারে লোকেদের পরস্পর-বিরোধী ও বিপরীত মন্তব্য এই কথারই স্বাক্ষর বহন করে যে, মানুষটির খ্যাতি ও মর্যাদা আছে। হযরত আলী (রাঃ)কে দেখ না, তাঁর ব্যাপারে দুই প্রকার মানুষ ধ্বংস হয়েছে; অতিভক্তির ভক্ত এবং তাঁর প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী। হাদীসে এসেছে যে, "তাঁর ব্যাপারে দুই ব্যক্তি ধ্বংস হবে; অতিভক্তির ভক্ত এবং মিথ্যা রচনা করে বিদ্বেষপোষণকারী।" আর এটাই হচ্ছে যশস্বী ও মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি এবং যিনি দ্বীন ও সম্মানের শীর্ষস্থানে পৌঁছেছেন তাঁর নিদর্শন।' *(জামেউ বায়ানিল ইল্ম ২/৪৩৯)*

২- ওরা আপনার সম্পর্কে যা বলে তাতে আপনি কোন ক্ষোভ প্রকাশ করবেন না এবং বিষণ্নও হবেন না। বরং এ ব্যাপারে আপনি হযরত নূহ (আঃ)কে প্রদত্ত আল্লাহ তাআলার অসীয়ত গ্রহণ করুন; তিনি বলেন, "নূহের প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছিল যে, 'যারা ঈমান এনেছে তারা ব্যতীত তোমার সম্প্রদায়ের অন্য কেউ কখনো ঈমান আনবে না। সুতরাং তারা যা করে তার জন্য তুমি ক্ষোভ করো না।" *(কুঃ ১১/৩৬)*

আর সেই অসিয়ত গ্রহণ করুন যা হযরত ইউসুফ (আঃ) তাঁর ভাইকে দান করেছিলেন; "আমিই তোমার (সহোদর) ভাই, সুতরাং ওরা যা করত তার জন্য তুমি দুঃখ করো না।" *(কুঃ ১২/৩৬)*

জেনে রাখুন যে, শয়তান প্রকৃতির মানব ও দানব নবীগণের শত্রু ছিল; যারা প্রতারণার উদ্দেশ্যে তাদের একে অন্যকে চমকপ্রদ বাক্য দ্বারা প্ররোচিত করত। *(কুঃ ৬/১১২)* আর আপনি নবীর ওয়ারেস। সুতরাং আপনার যে দুশমন থাকবে না, তা নয়।

৩- আপনার বিরুদ্ধে এই গুজব বা সমালোচনা যেন আপনাকে আপনার ন্যায্য ভূমিকা ও কর্তব্য থেকে অপসারিত না করে ফেলে। যেহেতু আপনি জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সহিত আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহ্বানকারী। অতএব তাঁরই উপর ভরসা রেখে আপনাকে ঐ পথ ও পদেই সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকা উচিত। আর আল্লাহ সত্যানুসারী সৎলোকদের অভিভাবক। আল্লাহ জাল্লা শানুহু বলেন, "সম্ভবতঃ তুমি আল্লাহ যা তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছেন তার কিছু বর্জন করবে এবং ব্যথিত হবে এই জন্য যে, তারা (তোমার সম্পর্কে) বলে, 'কেন তার উপর ধনভান্ডার অবতীর্ণ হয় না অথবা তার সাথে কোন ফিরিশ্তা আসে না?' (কিন্তু তা করা তোমার উচিত নয়।) -আসলে তুমি তো কেবল সতর্ককারী। এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ের দায়িত্বভার নিয়েছেন।" *(কুঃ ১১/১২)*

৪- আপনার চরিত্র ও আচরণে, অন্তর ও অভ্যন্তরে যেন অনাবিলতা, স্বচ্ছলতা ও সৃষ্টির প্রতি মমত্ব থাকে। যাতে আপনি অপরকে সহ্য করতে পারেন, রাগ সংবরণ করতে পারেন এবং যারা আপনার ইজ্জতের পিছে লেগেছে তাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে বিমুখতা অবলম্বন করতে পারেন।

তাদের ঐ সমস্ত রটনা নিয়ে আপনি স্বীয় হৃদয়াত্মাকে ব্যাপৃত করে আত্মগ্লানির শিকার হবেন না। বরং আপনি 'বোধ-স্বাতন্ত্র্য' ব্যবহার করুন। এটাই আত্মার মহানুভবতা, আকর-সারবত্তা এবং মুসলিমের সচ্চরিত্রতার পরাকাষ্ঠা। এতে আপনি

আপনার প্রতি অন্যায়কারী জালেমকে বীতস্পৃহ করে পরিবর্তিত ও নিরস্ত করতে সক্ষম হবেন।

(আপনি যেমনই হন না কেন, যত ভালোই হন না কেন তবুও সমালোচকদের বিরুদ্ধ সমালোচনার কবল থেকে রেহাই পাবেন না। কারণ, একই সঙ্গে আপনি সকলের মনমত অবশ্যই হতে পারবেন না।

একদা এক ব্যক্তি কোথাও যাচ্ছিল। সঙ্গে ছিল একটি গাধা ও তার এক ছেলে। ছেলেটিকে গাধার পিঠে বসিয়ে নিজে পায়ে হেঁটে পথ চলছিল। তা দেখে একদল লোক আপোসে বলতে লাগল, 'ছেলেটা কত বড় বেআদব! নিজে সওয়ার হয়ে বাপকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে!' এ সমালোচনা ছেলেটির কানে এলে সে গাধার পিঠ থেকে নেমে বাপকে বসতে বলল।

কিছুদূর অগ্রসর হতেই আর একদল লোক তাদেরকে দেখে আপোসে বলল, 'লোকটা কত বড় নির্দয়! নিজে সওয়ার হয়ে ছেলেটিকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল! দু'জনে চাপলেই তো হয়।'

এ সমালোচনা শুনে লোকটি ছেলেটিকেও গাধার পিঠে তুলে নিল। কিন্তু আরো কিছুদূর অগ্রসর হতেই আরো একদল লোকের সমালোচনা তাদের কানে এল; তারা বলল, 'ওঃ! লোকদু'টি কত নিষ্ঠুর! এক সঙ্গে দু'জন গাধার পিঠে চেপেছে, গাধাটার কত না কষ্ট হচ্ছে!'

এ মন্তব্য শুনে দু'জনেই গাধার পিঠ থেকে নেমে পায়ে হেঁটেই সফর করতে লাগল। কিন্তু পথিমধ্যে আরো একদল লোক তাদের সমালোচনা করে বলল, 'আরে! লোক দু'টো কত বোকা দেখ! সঙ্গে সওয়ার থাকতে হেঁটে হেঁটে পথ চলছে!'

চেষ্টা সত্ত্বেও কোন অবস্থাতেই বিরুদ্ধ মন্তব্য ও সমালোচনার হাত থেকে তারা নিজেদেরকে বাঁচাতে না পেরে পরিশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হল যে, সকল মন্তব্যকে উপেক্ষা করে যা করা ভালো তা করে যাওয়াই ভালো।

জেনে রাখুন, হরিণ কুকুরের চেয়ে অধিকতর বেগে দৌড়াতে পারে। কিন্তু যখনই সে তার পশ্চাতে কুকুরের দৌড় ও ধাওয়া দেওয়ার কথায় ভ্রূক্ষেপ করে মনে স্থান দেয় তখনই তার পায়ে জড়তা আসে; ফলে সে কুকুরের অনর্থক অত্যাচার থেকে বাঁচতে অক্ষম হয়। অন্যথায় কুকুর তার নাগাল পায় না। সুতরাং আপনি সত্যের অনুসারী হলে এবং বাতিল পন্থীরা আপনার পেছনে লাগলে সর্বদা এই প্রবাদ মনে রাখবেন, 'হাথী চলতা রাহেগা, কুত্তা ভুঁকতা রাহেগা।')

সর্ববিষয় তার যথার্থতার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু ফেনায়িত বস্তু তো ক্ষণকাল পরেই স্বতঃ বিলীন হয়ে যায়। *(তাসনীফুন্নাস, বকর আবু যায়দ ৭০-৭২পৃঃ)*

৫- আপনি বারংবার আত্মসমালোচনা করুন। নিজের দোষ আপনার নিকট ধরা পড়লে উদার মনে তা স্বীকার করুন। হঠকারিতা ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ না করে হকের প্রতি প্রত্যাবর্তন করুন। যেহেতু অন্যায় স্বীকার ও ত্যাগ করে ন্যায়ের প্রতি ফিরে আশায় মানহানি হয় না বরং মর্যাদাবর্ধন হয়।

পক্ষান্তরে বিপথগামী কোন আলেমের কোন ভ্রান্ত মত বা রায়কে খন্ডন করতে বা গঠনমূলক সমালোচনা করতে কতকগুলি নিয়ম জানা ও মানা আবশ্যিক ঃ-

১- তাতে ইখলাস, হিতৈষিতা, অপরের ব্যক্তিত্ব ও জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা। নিজের কীর্তিত্ব বা বড়াই প্রদর্শন উদ্দেশ্য না হওয়া। ভাষায় এমন ভাব-ভঙ্গিমা ও তীক্ষ্ণতা বা তিক্ততা থাকা উচিত নয়, যাতে বিপক্ষের মানহানি হয় অথবা তার যশে আঘাত লাগে। কারণ তা হলে 'হক' গ্রহণ করার আশা তার তরফ থেকে খুবই কম হয়ে থাকে। বরং অধিকভাবে বাতিলেই তার অবিচল ও অবিমৃশ্য থাকার আশঙ্কা থাকে।

২- খন্ডনে শরয়ী নসীহত ব্যবহার করা, যাতে সংহতি ও সম্প্রীতি বিনষ্ট না হয়ে যায়।

৩- এই বিরুদ্ধ-সমালোচনায় আল্লাহভীতি ও সংযমশীলতা রাখা।

৪- মুসলিম ভায়ের প্রতি সুধারণা রাখা এবং খেয়াল রাখা যে, ধারণা করা সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা।

৫- খন্ডনীয় বিষয়ের সুস্পষ্ট জ্ঞান ও ধারণা হওয়া এবং ন্যায় ও ইনসাফের সহিত খণ্ডন বা গঠনমূলক সমালোচনা করা। অন্যায়ভাবে বা অজান্তে কোন বিষয়ে কটুক্তি ও মন্তব্য করা উচিত নয়।

৬- অপরের দোষ-গুণ বর্ণনায় ন্যায়পরায়ণতা ব্যবহার করা।

৭- অবদান, উপকার ও মাহাত্ম্যের আধিক্যকে দৃষ্টিচ্যুত না করা।

৮- লোকেদের মাঝে শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য দানে ন্যায্যতা রাখা।

৯- ভক্তি ও বিদ্বেষে সঠিক পদ্ধতি ব্যবহার করা।

১০- এক জনের ভুলকে এক জামাআতের সাধারণ ভুল অথবা কারো চারিত্রিক ত্রুটিকে নীতির ত্রুটি মনে না করা।

মোট কথা, এ বিষয়ে অন্যায় ও কুপ্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। যুল্‌ম কিয়ামতের অন্ধকার, প্রত্যেক কল্যাণের মূল হচ্ছে ইল্‌ম (সঠিক জ্ঞান) ও ন্যায়পরায়ণতা এবং প্রত্যেক অকল্যাণের মূল হচ্ছে মূর্খতা ও অন্যায়। *(ওয়াকেউনাল মুআসির, মুহাম্মদ উসাইমীন)*

আল্লাহর তরফ তেকে অনুপ্রাণিত ও তওফীকপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও আলেম; যিনি আল্লাহর তওহীদ মান্য ও সম্প্রচার করেন, ইখলাস ও সওয়াবের উদ্দেশ্য নিয়ে, যথাসাধ্য পরিপূরক বিষয় নিয়ে, তাঁর প্রকাশ্য ও গুপ্ত ইবাদত ও আনুগত্য করে আল্লাহর জন্য হিতোপদেষ্টা হন।

আল্লাহর কিতাবের জন্য হিতৈষী হন, তাতে উল্লেখিত যাবতীয় বিষয়াদির উপর বিশ্বাসস্থাপন করে ও ঈমান এনে, তা এবং তার সম্পৃক্ত যাবতীয় ইল্‌ম শিক্ষা করার জন্য প্রয়াসী হয়ে।

রসূল ﷺ এর জন্য হিতোপদেষ্টা হন, আনীত দ্বীনের মুখ্য ও গৌণ সকল বিষয়ের উপর ঈমান এনে, আল্লাহর মহব্বতের পর তার মহব্বতকে সকল ব্যক্তি ও বস্তুর মহব্বতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে এবং তাঁর শরীয়তের গুপ্ত ও প্রকাশ্য সমস্ত বিষয়ে কেবল তাঁরই অনুকরণ ও অনুসরণ করে।

মুসলিম সমাজের ইমাম, নেতা ও ওলামাবর্গের জন্য হিতোপদেষ্টা হন, তাঁদের জন্য শুভকামনা করে এবং সেই শুভ ও মঙ্গল সাধনে কথা ও কর্ম দ্বারা তাঁদের সহযোগীতা করে, তাঁদের প্রজা ও অনুগামীদের আনুগত্য ও বশ্যতার আশা রেখে এবং তাঁদের বিরোধিতা, অবাধ্যতা ও বিদ্রোহ কামনা ও প্রকাশ না করে।

মুসলিম জনসাধারণের জন্য হিতোপদেষ্টা হন, নিজের জন্য যা পছন্দ করেন তা অপরের জন্যও পছন্দ করে, যা নিজের জন্য অপছন্দ করেন তা অপরের জন্যও অপছন্দ করে, যথাসাধ্য যে কোন উপায়ে অপরের জন্য উপকার ও কল্যাণ সাধন করে, তাঁর ভিতর-বাহির এবং কথা ও কর্মকে এক করে। সকলকে এই সুন্দর শাশ্বত মানবতার দ্বীনের প্রতি আহ্বান করে ও তাদেরকে দোযখের মুখ হতে রক্ষা করে।

এই তো সেই আলেম, যাঁর চরিত্রে ও পরিবারে অন্যের নসীহতের দরকার পড়ে না এবং এই তো সেই মুবাল্লেগ, যাঁর অধীনস্থ লোক, ছাত্র ও মাদ্রাসার জন্য বাইরের কোন তবলীগের প্রয়োজন হয় না।

** সমাপ্তি **